গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭১ বর্ষ ৩৭ সংখ্যা ২৬ এপ্রিল - ২ মে ২০১৯ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.com আট পাতা মূল্য ঃ ২ টাকা

হিন্দুত্ববাদী টেররিস্টকে প্রার্থী করল বিজেপি

বাপ রে অভিশাপের কী তেজ! যার জেরে একজন ডাকসাইটে আইপিএস অফিসারের পর্যন্ত জীবন চলে যেতে পারে! এই ঘোর কলিকালে উপস্থিত কোন মহাতপস্বী তিনি? ইতিমধ্যে সংবাদমাধ্যমের দৌলতে সারা দেশের মানুষ জেনে গেছে যে, তিনি বিজেপির শেষ ভরসা আগুনখোর হিন্দুত্ববাদী ব্র্যান্ডের অন্যতম— ভোপালে দলের প্রার্থী, প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর বা সাধ্বী প্রজ্ঞা। তিনি সংবাদমাধ্যমে বিবৃতি

দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, মহারাষ্ট্র পুলিশের অ্যান্টি টেরোরিজম স্কোয়াড (এটিএস) -এর প্রধান হেমন্ত কারকারে তাঁর অভিশাপেই মুম্বই হামলার দিনে সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে প্রাণ দিয়েছেন। অবশ্য পরে একটু ঢোক গিলে নামকাওয়াস্তে 'কথা প্রত্যাহার করছি' বললেও তিনি বা তাঁর দল কিংবা তাঁর পূজিত প্রধানমন্ত্রী কোথাও ক্ষমা চাননি।

ভোটারদের কাছে প্রজ্ঞার কোন মহৎ কর্মটি তুলে ধরতে চায় বিজেপি? তিনি ২০০৮ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর মহারাষ্ট্রের মালেগাঁওতে বিস্ফোরণ এবং নরহত্যার দায়ে অভিযুক্ত। এই বিস্ফোরণে ৬ জন প্রাণ হারিয়েছিলেন, ১০০-র বেশি মানুষ গুরুতর আহত হয়েছিলেন। মহারাষ্ট্র সরকারের পুলিশ তদন্ত করতে গিয়ে দেখে 'অভিনব ভারত' নামে আরএসএস ঘনিষ্ঠ উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন এর পিছনে আছে। সনাতন সংস্থা, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ইত্যাদি সংগঠনের নামও নানা ভাবে এই ঘটনার সাথে জড়িয়ে আছে। বিজেপি এবং শিবসেনা প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে এই মামলায় অভিযুক্তদের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেছে একাধিকবার। এই মামলা

দুয়ের পাতায় দেখুন

মনোনয়ন জমা দিলেন উত্তর কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ডাঃ বিজ্ঞান কুমার বেরা

মোদিজির আসল 'ভাইয়োঁ ঔর বহেনোঁ' কারা

সংবাদপত্র আর টিভি চ্যানেলগুলিতে এখন প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎকারের বন্যা বইছে। আর সেগুলিতে প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি ছড়াচ্ছেন তিনি। বলছেন, আর একবার আমাদের সুযোগ দেওয়া হোক। এবার আমরা মানুষের জন্য কাজ করব। তিনি বলেছেন, "২০১৪-র ভোট ছিল আশা-আকাঙ্ক্ষার। ২০১৯-এর ভোট হল আত্মবিশ্বাস ও অগ্রগতির।" কার অগ্রগতির কথা বলছেন প্রধানমন্ত্রী? তা কি দেশের নিরানব্বই ভাগ সাধারণ মানুষের? কী উন্নয়ন গত পাঁচ বছরে তাঁদের জীবনে নিয়ে এসেছেন তাঁরা? তার হিসেব তাঁরা দিচ্ছেন না কেন? তা দিলে তো দেশের মানুষ বুঝে নিতেন কার কোন অগ্রগতির কথা তাঁরা বলছেন।

গত লোকসভা নির্বাচনে কল্পতরু সেজেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। বলেছিলেন, তিনি ক্ষমতায় এলে মানুষ সব পাবে। একচেটিয়া পুঁজির মালিকানাধীন সংবাদমাধ্যম তাঁর নাম দিয়েছিল 'বিকাশ পুরুষ'। প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, মূল্যবৃদ্ধি রোধ হবে, দুর্নীতি দূর হবে, কালো টাকা উদ্ধার হবে, দেশের সব মানুষ তার ভাগ পাবে, বেকাররা কাজ পাবে, শ্রমিকরা ন্যায্য অধিকার পাবে, কৃষকরা ফসলের ন্যায্য দাম পাবে, সবার জীবনে সুদিন আসবে, এরকম আরও কত কী!

এ বারের নির্বাচনটা তো হওয়া উচিত ছিল প্রতিশ্রুতিগুলি প্রধানমন্ত্রী কতটা কার্যকর করেছেন তা যাচাইয়ের উপর। অথচ প্রধানমন্ত্রী কিংবা তাঁর দলের নেতারা কিন্তু সে-হিসেবের ধারকাছ দিয়েও যাচ্ছেন না। মানুষ অবশ্য তাদের জীবনের অভিজ্ঞতায় পরিষ্কার বুঝেছে, বিজেপি শাসনে তাদের জীবনে কোনও সুদিন আসেনি, বরং দুর্গতি অনেক বেড়েছে। শুধু ধনীরাই আরও ধনী হয়েছে। রোধ দূরের কথা, মূল্যবৃদ্ধি লাগামছাড়া হয়েছে। একটি কালো টাকাও উদ্ধার হয়নি। একজন কালো টাকার মালিকও গ্রেপ্তার হয়নি। উপরন্তু পুঁজিপতিরা লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কগুলি থেকে নিয়ে উধাও হয়ে গেছে। কাউকে গ্রেফতার করেনি সরকার। বেকারদের জন্য বছরে দু'কোটি কাজের প্রতিশ্রুতি কত বড় মিথ্যাচার তা আজ প্রমাণিত। গত পঁয়তাল্লিশ বছরে বেকারি সর্বোচ্চ আকার নিয়েছে। কৃষকের আত্মহত্যা বন্ধে সরকারের কোনও পদক্ষেপ নেই। সার, বীজ, বিদ্যুৎ, কীটনাশকের দাম কমানোর, কৃষিপণ্যের একচেটিয়া ব্যবসায়ী দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের হাত থেকে কৃষককে বাঁচানোর কোনও চেষ্টা নেই। তাঁরা নাকি ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকের আয় দ্বিগুণ করে দেবেন। কী ভাবে করবেন, তা তারাও জানেন না, দেশের কৃষকরাও জানে না। নোট বাতিল এবং জিএসটি চালু করে প্রধানমন্ত্রী দেশের উন্নয়নের প্রয়োজনে একে বিরাট পদক্ষেপ বলেছিলেন। অর্থনীতিতে তার ফল দেশের মানুষের জীবনে কী প্রভাব ফেলেছে নির্বাচনী বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী সে প্রসঙ্গ সাবধানে এড়িয়ে যাচ্ছেন। কারণ নোট বাতিলে কালো টাকার মালিকদের গায়ে আঁচড়টিও পড়েনি। কিন্তু শ্রমিক, কৃষক সহ সাধারণ মানুষ, ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের যে সর্বনাশ হয়েছে আজও তারা তা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। একই ভাবে জিএসটি ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের উপর বিরাট বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছে তারা, প্রধানমন্ত্রীর কোনও বক্তৃতার মলমই তাদের সেই ক্ষত সারাতে পারছে না।

বিজেপি নেতারা বুঝে গেছেন তাঁদের মিথ্যাচার ধরা পড়ে গেছে। দেশের মানুষ তাঁদের আর বিশ্বাস করছে না। তিন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে তা স্পষ্ট হয়ে গেছে। তাই জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি এড়িয়ে উগ্র জাতীয়তাবাদের জিগির তুলছেন,

চারের পাতায় দেখুন

মনোনয়ন জমা দিলেন এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থীরা

২২ এপ্রিল মনোনয়নপত্র জমা দিতে চলেছেন দক্ষিণ কলকাতা, জয়নগর, যাদবপুর, মথুরাপুর ও ডায়মণ্ডহারবার কেন্দ্রের প্রার্থী যথাক্রমে দেবব্রত বেরা, জয়কৃষ্ণ হালদার, সুজাতা ব্যানার্জী, পূর্ণচন্দ্র নাইয়া ও অজয় ঘোষ (বাঁ দিক থেকে)

হিন্দুত্ববাদী টেররিস্টকে প্রার্থী করল বিজেপি

একের পাতার পর

লড়ার জন্য তারা সমস্ত অভিযুক্তদের আর্থিক দায়িত্বও নিয়েছে। এ হেন দাগী সন্ত্রাসবাদী সাধ্বী প্রজ্ঞা সিং ঠাকুরের সেই ভাবমূর্তিতেই ভরসা রেখেছে বিজেপি।

কিছুদিন আগে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি পশ্চিমবঙ্গের নেতাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন, নীতি-ফিতি দেখার দরকার নেই— ভোটে জেতাটাই আসল কথা (আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩ মার্চ ২০১৯)। তাঁর দিক থেকে এ- কথার কোনও অন্যথা হয়েছে, এমন অপবাদ তাঁর অতিবড় শত্রুও দিতে পারবে না। নীতি-নৈতিকতা-আদর্শের বালাই বিজেপির কোনও দিন ছিল না, থাকার কথাও নয়। কিন্তু দলের শুরুর দিকে নীতিনিষ্ঠতার একটা ভড়ং ছিল, এখন সে আলখাল্লাটুকুও আর গায়ে রাখতে পারছে না তারা। ভোটের মুখে তারা বলবেই বা কী! বেকারদের কাজ, কৃষকের ফসলের দাম, ঋণের জাল থেকে কৃষকের মুক্তি, নারী নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য-শিক্ষার উন্নতি, দেশের মানুষের অন্নসংস্থান, এসব নিয়ে কোনও কথা উচ্চারণ করাও নরেন্দ্র মোদির দলের পক্ষে সম্ভব নয়। যেমন সম্ভব নয় কালোটাকার রমরমার বিরুদ্ধে কিছু বলা, কিংবা নোট বাতিলে কী কী সুফল দেশ পেল, তা নিয়ে কোনও কথা উচ্চারণ করা। তাই এখন তাদের একমাত্র হাতিয়ার, জঙ্গী হিন্দুত্ববাদের জিগির তুলে ধর্ম-সম্প্রদায়ভিত্তিক মেরুকরণ সৃষ্টি করা। তথাকথিত হিন্দুত্বের চ্যাম্পিয়ন সেজে উগ্র ধর্মান্ধতার ভিত্তিতে দেশে বিদ্বেষের বাতাবরণ তৈরি করে ভোটে লড়া ছাড়া বিজেপির আর কোনও পুঁজি নেই। সেনা জওয়ানদের ছবি টাঙিয়ে, বালাকোটে বিমান হামলা থেকে শুরু করে নানা বিষয়কে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচার করে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এক লড়াকু যোদ্ধা সেজে ভোটের মঞ্চে নামতে চেয়েছিল বিজেপি। ট্র্যাজেডি হল, সন্ত্রাসবাদে অভিযুক্তরাই এখন তাদের ভোট প্রচারের হাতিয়ার। সমঝোতা এক্সপ্রেস বিস্ফোরণ মামলার রায় দিতে গিয়ে বিচারক যথার্থই বলেছেন, 'সন্ত্রাসবাদের কোনও জাত-ধর্ম হয় না'। আইসিস, লস্কর-ই-তৈবাও ধর্মের নামে মানুষকে মারে, সাধু কিংবা সাধ্বী সাজা প্রজ্ঞা সিং, অসীমানন্দরাও তাই করেন। পার্থক্য কোথায়?

মালেগাঁও বিস্ফোরণের তদন্তে নেমে পুলিশ দেখে বোমা বিস্ফোরণে ব্যবহৃত মোটর বাইকটির মালিক আরএসএস-বিজেপির ছাত্র শাখা এবিভিপির প্রাক্তন নেত্রী সাধ্বী প্রজ্ঞা। পুলিশি তদন্তে পরিষ্কারভাবে বেরিয়ে আসে, এই সন্ত্রাসবাদী হামলায় মূল চক্রীদের অন্যতম হলেন প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর, যিনি সাধ্বীর খোলস ধারণ করে থাকেন। বস্তুত ২০০৬-এ মালেগাঁওতে প্রথম বিস্ফোরণ, ২০০৭-এ হায়দরাবাদের মক্কা মসজিদে বিস্ফোরণ, ওই একই বছরে সমঝোতা এক্সপ্রেসে বিস্ফোরণ, আজমের শরিফে বিস্ফোরণে বহু মানুষকে হত্যার ঘটনার সাথেও সাধ্বী প্রজ্ঞার নাম জড়িয়ে আছে। প্রজ্ঞা, অসীমানন্দ সহ তাঁর এবং তাঁর সহযোগীদের লক্ষ্যই ছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে হত্যা করে তথাকথিত 'ইসলামিক জেহাদে'র পাল্টা 'হিন্দু জেহাদ' করা। একথা তাঁরা প্রকাশ্যে বারবার বলেছেনও। সমঝোতা এক্সপ্রেস মামলায় বিচারক পর্যন্ত এক সাক্ষীকে উদ্ধৃত করে রায়ে একথা উল্লেখ করেছেন।

কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের কাজের একটু খোঁজ রাখলেই জানা যায় যে জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ) বাস্তবে চলে তিনটি লোকের অঙ্গুলি হেলনে। তার মধ্যে একজন সরকারের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা তথা এনআইএ প্রধান নিজে। আর দু'জন হলেন প্রধানমন্ত্রী এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি। সেই এনআইএ বিজেপি ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধে আদালতে কেমন মামলা লড়তে পারে তা সহজেই অনুমেয়। তাই সমঝোতা এক্সপ্রেস থেকে শুরু করে মক্কা মসজিদ সহ কোনও মামলাতেই 'কট্টর হিন্দুত্ববাদের জ্বলন্ত প্রতীক' এই সাধ্বী প্রজ্ঞা, অসীমানন্দদের বিরুদ্ধে তারা কিছু প্রমাণের চেষ্টাই কখনও করেনি। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরেই ২০১৫ সালে এনআইএ, সাধ্বী প্রজ্ঞাকে ক্লিন চিট দিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, তদন্তে কিছুই পাওয়া যায়নি। কিন্তু এনআইএ বিশেষ আদালতের বিচারক তাদের সাথে একমত হতে পারেননি। তিনি পরিষ্কার বলেছিলেন, 'এ কথা ভাবার কোনও কারণ নেই যে, আসামী নম্বর-এক জানত না তার মোটর সাইকেলটি কোন কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।' শুধু তাই নয় বিচারক রায়ে উল্লেখ করেছিলেন, 'বিস্ফোরণে মৃতের সংখ্যা কম হওয়াতে তিনি (প্রজ্ঞা) অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। ফলে আসামী নম্বর-এক বর্তমান অপরাধের সাথে কোনওভাবে যুক্ত ছিল না, এনআইএ-র এই যুক্তি মেনে নেওয়া সম্ভব নয়' (ফার্স্ট পোস্ট, ১৮ এপ্রিল ২০১৯)। এমন ঘটনা সমঝোতা এক্সপ্রেস এবং হায়দরাবাদের মক্কা মসজিদ সহ সবগুলি মামলার ক্ষেত্রেই ঘটেছে। বিজেপি সরকারের প্রত্যক্ষ নির্দেশে এনআইএ কিংবা সিবিআই কোনও প্রমাণ পেশ করেনি। মক্কা মসজিদ মামলায় সরকারি তদন্ত সংস্থার অসহযোগিতায় সকলকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন বিচারক। তাই রায় ঘোষণা করেই তিনি বিচারকের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। সমঝোতা এক্সপ্রেস মামলায় বিচারক গভীর দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলেন, সব কিছু বোঝা গেলেও তদন্তকারীদের অনিচ্ছার জন্য অপরাধীকে শাস্তি দিতে না পারাটা বিচারক জীবনের এক গভীর দুঃখের অধ্যায়।

সমঝোতা এক্সপ্রেস বিস্ফোরণ মামলার রায় দিতে গিয়ে বিচারক যথার্থই বলেছেন, 'সন্ত্রাসবাদের কোনও জাত-ধর্ম হয় না'। আইসিস, লস্কর-ই-তৈবাও ধর্মের নামে মানুষকে মারে, সাধু কিংবা সাধ্বী সাজা প্রজ্ঞা সিং, অসীমানন্দরাও তাই করেন। পার্থক্য কোথায়?

সন্ত্রাসবাদী হামলায় নিহত পুলিশ অফিসার হেমন্ত কারকারেকে নিয়ে সাধ্বী প্রজ্ঞা অতি কুৎসিত এবং অমানবিক মন্তব্য করলেও দলগতভাবে বিজেপি তার নিন্দাটুকুও করেনি। প্রধানমন্ত্রী বুক বাজিয়ে কত কথাই না বলেন, অথচ এই নিয়ে তাঁর নীরবতাই আসলে সবচেয়ে বেশি বাঙ্ময়। ২৬ নভেম্বর, ২০০৮ মুম্বই হামলার কিছুক্ষণ আগে কারকারে টিভি সাক্ষাৎকারে জানান, হিন্দুত্বের নাম করে এই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জাল গুটিয়ে আনা হচ্ছে, আরও কিছু প্রভাবশালী লোক এই মামলায় গ্রেপ্তার হবেন খুব শীঘ্রই। কিন্তু তিনি আর সময় পাননি। মুম্বই হামলার খবর পেয়েই তিনি কর্মক্ষেত্রে চলে যান। সেখানে বন্দুকবাজদের হামলায় তিনি ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। এই মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, কারণ হেমন্ত কারকারের বুলেটপ্রুফ জ্যাকেটটি নাকি খুঁজেই পাওয়া যায়নি। প্রশ্ন ওঠে আসলের বদলে একটি নকল জ্যাকেট দিয়েই তাঁকে লড়তে পাঠানো হয়েছিল কিনা? অরক্ষিত অবস্থায় তাঁকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিল কারা? এই প্রশ্নটাকে কংগ্রেস-বিজেপি-শিবসেনার মতো দলগুলি চিরকালই চাপা দিতে চেয়েছে। কারণ তাদের হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক হারানোর আশঙ্কা এর সাথে যুক্ত। ২০০৮-এর অক্টোবরে সাধ্বী প্রজ্ঞা সহ অন্যদের গ্রেপ্তারের পর থেকেই যে তাঁর উপর চাপ আসছিল কারকারে সেটা মুম্বই পুলিশের তৎকালীন কমিশনার জুলিও রিবেইরোকে জানিয়েছিলেন। কারকারে তাঁকে বলেছিলেন, মহারাষ্ট্রের বিজেপি সরকারের এক ক্যাবিনেট মন্ত্রী এবং নানা হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠী তাঁকে এই মামলা দুর্বল করতে চাপ দিচ্ছে। রিবেইরো স্মৃতিচারণ করে বলেছেন, সরকারি উকিল নিজেই আদালতে দাঁড়িয়ে অভিযোগ করেছিলেন যে, মামলা নিয়ে ধীরে চলার জন্য সরকারপক্ষ থেকেই চাপ আসছে (ইকনমিক টাইমস, ২০ এপ্রিল ২০১৯)।

কারকারের মৃত্যুর পর বিস্ফোরণ মামলাগুলি পুরোপুরি গতি হারায়। সেই সময় যিনি মালেগাঁও মামলার পাবলিক প্রসিকিউটর ছিলেন, সেই রোহিনী সালিয়ান এনডি টিভির এক সাক্ষাৎকারে সম্প্রতি জানিয়েছেন, ২০১৫-তে মামলা দুর্বল করার জন্য এনআইএ তাঁকে নানাভাবে চাপ দিতে থাকলে তিনি মামলা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি আরও বলেছেন, প্রজ্ঞা সিং ঠাকুরকে যে কোনও চাপ দিয়ে, অত্যাচার করে স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়নি, এ বিষয়ে আদালত এবং তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিত (এনডি টিভি, ২১ এপ্রিল ২০১৯)। অর্থাৎ প্রজ্ঞা সিংকে বাঁচাতে এনআইএ-কে সরাসরি কাজে লাগিয়েছে বিজেপি। বিশেষ স্বার্থ রক্ষার জন্যই হেমন্ত কারকারে-কে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল, প্রজ্ঞা সিংয়ের অভিশাপ তত্ত্ব আরও একবার সেই সন্দেহকেই জোরদার করল। মুখোস খসে গিয়ে আরও একবার প্রকট হল প্রজ্ঞা সিংদের মতো বিজেপির আসল মুখ।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি)-র দক্ষিণ ২৪পরগণা জেলার জয়নগর থানার দক্ষিণ বারাসাতের দলের আবেদনকারী সদস্য কমরেড স্বপন দাস ৩১ মার্চ তৃতীয়বার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার সাথে সাথেই বহু কর্মী-সমর্থক তাঁর বাড়িতে যান। দক্ষিণ বারাসাত পার্টি অফিসে তাঁর মরদেহে মাল্যদান করেন কমরেড সুবীর দাস। '৬০-এর দশকে কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী-কমরেড শচীন ব্যানার্জীর সংস্পর্শে এসে কমরেড স্বপন দাস দলের সাথে যুক্ত হন। কলকাতায় একটি বেসরকারি কোম্পানিতে কাজ করার সুবাদে তিনি দলের শ্রমিক সংগঠন এ আই ইউ টি ইউ সি-র সাথে দীর্ঘদিন কলকাতায় ট্রেড ইউনিয়ন ও দলের কাজ করেছেন। বিগত চার-পাঁচ বছর তিনি দক্ষিণ বারাসাত লোকাল কমিটির নেতৃত্বে পার্টির আঞ্চলিক কর্মপ্রক্রিয়ায় যুক্ত থেকে কাজ করেছেন। কিছুকাল স্থানীয় অফিস সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেন।

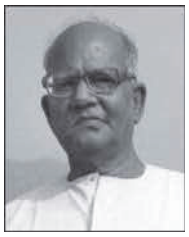

নিজ উদ্যোগে তিনি অনেককে গণদাবী গ্রাহক করেছেন, তাঁদের ছাড়াও দল মত নির্বিশেষে আরও বেশ কয়েকজনকে তিনি গণদাবী দিতেন নিয়মিত। জীবনের ঝুঁকি নিয়েই তিনি গত নভেম্বরে দলের তৃতীয় কংগ্রেসে জামশেদপুরে প্রকাশ্য সমাবেশে মিছিলে ও সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। অসুস্থতাকে উপেক্ষা করে তিনি 'জনস্বার্থে নির্বাচনকে কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে হবে' বইটি বিক্রি করেন। অঞ্চলের অনেক পরিবারের সঙ্গেই তাঁর আন্তরিক সম্পর্ক ছিল।

৭ এপ্রিল দক্ষিণ বারাসাত কোঅপারেটিভ সোসাইটির স্বয়ংসেবা ভবনে তাঁর স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুবীর দাস, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড তরুণ নস্কর। সভাপতিত্ব করেন দক্ষিণ বারাসাত লোকাল সম্পাদক কমরেড দিব্যেন্দু মুখার্জী।

কমরেড স্বপন দাস লাল সেলাম

প্রায় মাসাধিককাল বার্ধক্যজনিত রোগে অসুস্থ থেকে কলকাতার রাসবিহারী আলিপুর আঞ্চলিক কমিটির সদস্য কমরেড গোপাল সাহা ১৬ মার্চ কলকাতার পি জি হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯।

১৯৬৬ সালে আশুতোষ কলেজে পাঠরত অবস্থায় কমরেড গোপাল সাহা ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও-র মাধ্যমে দলে যোগদান করেন। ১৯৮৫ সালে কলকাতা পৌরসভা নির্বাচনে ৭৯ নং ওয়ার্ডে দলের পক্ষ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ১৯৯২ সালে তদানীন্তন ইনচার্জ কমরেড অমর দত্তের অকাল প্রয়াণের পর আলিপুর-চেতলা লোকাল কমিটির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষক সংগঠন এস টি ই এ-র অফিস সম্পাদকের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। ২০০৯ সালে অবসর গ্রহণের পরও সেই দায়িত্ব দক্ষতার সাথে পালন করে গেছেন। নিখুঁত কাজ করতে তিনি সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। দল যখন যা দায়িত্ব দিয়েছে তা পালনে তাঁর কোনও শৈথিল্য দেখা যায়নি।

তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে দল একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে হারাল। ২৪ মার্চ চেতলা কৈলাস বিদ্যামন্দিরে তাঁর স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য কমরেড করুণা ভট্টাচার্য।

কমরেড গোপাল সাহা লাল সেলাম

মে দিবসের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা পাবেই

বছরে ২ কোটি নতুন চাকরির প্রতিশ্রুতি হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। বেকারির অন্ধকারে ডুবে থাকা এই দেশে যাদের চাকরি আছে, যে কোনও মুহূর্তে সেটা হারাবার আশঙ্কা নিয়ে দিন কাটে তাদের। সুযোগ নেয় মালিক। সামান্য টাকা ছুঁড়ে দিয়ে দিনে ১২ ঘন্টা এমনকী ১৪ ঘন্টা পর্যন্ত খাটিয়ে নেয় শ্রমিকদের। তাদের বাস করতে হয় নোংরা ঘিঞ্জি বস্তিতে। শ্রম-অধিকার আজ আকাশের চাঁদের মতোই ধরাছোঁয়ার বাইরে।

এই অবস্থায় আবার এসেছে ১ মে— মেহনতি মানুষের রক্তঝরানো লড়াইয়ের গৌরবময় স্মৃতিমাখা 'মে দিবস'। শত উত্থান-পতন, শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তার মর্যাদা ও তাৎপর্য এতটুকু ম্লান হয়নি। মুমূর্ষু বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার মরিয়া চেষ্টায় দিনে দিনে আরও শোষণমূলক, উৎপীড়ক, বৈষম্যমূলক ও আগ্রাসী রূপ নিচ্ছে। এর বিরুদ্ধে বিশ্ব জুড়ে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে উঠছে যেখানে শুধুমাত্র আর্থ-সামাজিক সমস্যাগুলির বিরুদ্ধে নয়, স্লোগান উঠছে খোদ পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটারই বিরুদ্ধে। শ্রমিক, চাষি, মধ্যবিত্ত এমনকী গোটা বিশ্বের বুদ্ধিজীবী মহলের একটি প্রধান অংশ মে দিবসের দাবি-দাওয়া ও তাৎপর্যের প্রতি প্রকাশ্যে সমর্থন জানাচ্ছেন। তাই সময় এসেছে এই দিনটির মহত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার। বোঝার সময় এসেছে, মানুষের ইতিহাসে মে দিবসের সুবিশাল তাৎপর্য।

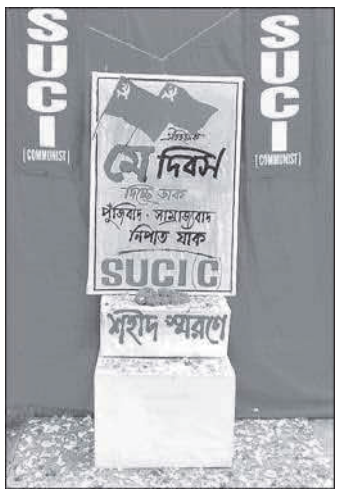

১৮৮৬ সালের সেই মে দিবসে শ্রমিকরা দাবি করেছিল কাজের সময় হবে ৮ ঘন্টা। একেবারেই গণতান্ত্রিক দাবি। মালিক পুঁজিপতিরা ভাড়াটে গুন্ডা আর পুলিশ সাথে নিয়ে বুলেট দিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল তাদের। নেতাদের প্রকাশ্যে ফাঁসি দিয়েছিল। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সেইসময় সবে বিশ্ব জুড়ে তার শিকড় বিস্তার করছে। আজ পুরোপুরি মরণের মুখে দাঁড়িয়ে আছে এই ব্যবস্থা। মানব জীবনের সব ক্ষেত্রে সমাজজীবন, ব্যক্তিজীবন, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক স্তরে সর্বাত্মক সংকট সৃষ্টি করছে। সংকট যত বাড়ছে, পুঁজিবাদ তত বেশি হিংস্র হয়ে উঠছে। পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের প্রগাঢ় সমর্থকরাও আজ এ কথা অস্বীকার করতে পারছে না যে, গোটা বিশ্বপুঁজিবাদী ব্যবস্থাটাই ডুবছে ক্রমবর্ধমান অতল সংকটের গহ্বরে। পুঁজিবাদী বিশ্বের ইঞ্জিন বলে পরিচিত আমেরিকা গোটা বিশ্ববাজার দখলের উদ্দেশ্যে বিশ্বায়নের নীতি চালু করে দুনিয়া জুড়ে মুক্ত বাণিজ্যের স্লোগান তুলেছিল। সেই আমেরিকা আজ 'আমেরিকা প্রথম' আওয়াজ তুলে নিজের বাজারকে ঘেরাটোপে বাঁধতে চাইছে। অন্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সঙ্গে ভয়ঙ্কর বাণিজ্যযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে আমেরিকা, যাতে তারা বাজার দখল করতে না পারে। এই সংকটের কারণ কী? ক্রমাগত শোষণের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা চূড়ান্ত অর্থনৈতিক মন্দা ও শিল্প কলকারখানায় বদ্ধদশার জন্ম দিয়েছে যা থেকে সৃষ্টি হচ্ছে ভয়ংকর বেকারি, আকাশ ছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়া আর ব্যাপক দারিদ্র এখন প্রায় সমস্ত পুঁজিবাদী দেশেরই বৈশিষ্ট্য, সে আমেরিকা হোক বা আফ্রিকার কোনও গরিব দেশ। সমস্ত পুঁজিবাদী দেশই আজ অবশ্যম্ভাবী রূপে বাজার সংকটের জালে জড়িয়ে পড়ছে। এর থেকে বেরনোর কোনও রাস্তা তাদের জানা নেই।

বেকারি, বৈষম্য, বাধ্যতামূলক শ্রম আজকের পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য

স্পষ্টত আজ দুনিয়া জুড়ে প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশেই জনজীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল কোটি কোটি মানুষের বেকারি, যা ক্রমাগত বাড়ছে। পাশাপাশি শিল্পায়নের অব্যাহত ধারা আজ অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিবর্তে তীব্র ও ক্রমবর্ধমান মন্দা, শিল্পে বদ্ধ দশা, মজুরি না বাড়া, চাকরির অনিশ্চয়তা এবং কারখানা বন্ধ হওয়া, ছাঁটাই, লে-অফ ইত্যাদির কারণে ব্যাপক বেকারি অন্ধকার ছায়া ফেলেছে। শ্রমিকদের দুর্দশা আরও বাড়িয়েছে কাজের কঠিন শর্ত।

ভারতেও বেকার সমস্যা গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে। পুঁজিবাদী সরকারগুলি গরিব চাষিদের উর্বর জমি কেড়ে নিয়ে এসইজেড তৈরি বা রিয়েল এস্টেটের ব্যবসার জন্যে পুঁজিমালিকদের তা উপহার দিচ্ছে। এর জন্যে চালু আইন পর্যন্ত তারা পাল্টে ফেলছে। এর ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ কাজ তো বটেই, মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকুও হারাচ্ছে।

আজকের দিনে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অপর অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য যা শ্রমিকের দুরবস্থা আরও বাড়িয়ে তুলেছে, তা হল আয় বৈষম্য। মুষ্টিমেয় কিছু ধনী এই সমাজে যাবতীয় সুযোগ সুবিধা,আরাম আয়েশ ভোগ করছে, আর মোট জনসংখ্যার ৮০ শতাংশকে ক্রমাগত সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার বাইরে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। বিশেষত সাম্প্রতিক বিশ্বজোড়া মহামন্দার পর অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। লিঙ্গবৈষম্য, জাত-পাত-ধর্মের বৈষম্য ইত্যাদি ক্রমাগত বেড়ে চলেছে এবং শ্রমিক শ্রেণির মানুষের ঐক্যে তা ভাঙন ধরাচ্ছে, মজুরে মজুরে দ্বন্দ্ব বাড়িয়ে তুলছে। অর্থনৈতিক ভাবে উন্নত ও পিছিয়ে পড়া— সমস্ত দেশেই অভিবাসী শ্রমিকদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের দ্বারা মানবিকতা লঙ্ঘিত হচ্ছে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিক-কর্মচারীরা মজুরি-দাস ছাড়া অন্য কিছু নয়। বিশ্বায়নের নীতি এর সঙ্গে যোগ করেছে অমানবিক বাধ্যতামূলক শ্রম ও দাস শ্রমিকের সমস্যা। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক যে কোনও জায়গায় যে কোনও রকম একটা কাজ খুঁজতে গিয়ে দাস শ্রমিক বনে যাচ্ছে। এদের অনেকেই 'উন্নয়নে'র অজুহাতে উচ্ছেদ হওয়া, কিংবা যুদ্ধ বা দাঙ্গা পীড়িত দেশের মানুষ। চরম দারিদ্র মানুষকে, বিশেষত চাষিদের ভয়ঙ্কর ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে দিচ্ছে। পরিণতিতে তারা হয় দাস-শ্রমিক, নয়ত পরিযায়ী শ্রমিকে পরিণত হচ্ছে। তা না হলে আত্মহত্যাই শেষ বিকল্প হিসাবে পড়ে থাকছে তাদের জন্য। বিশ্ব জুড়ে নারী ও শিশুপাচার ভয়ঙ্কর ভাবে বাড়ছে, পাশাপাশি নাইজেরিয়া, লিবিয়া সহ আফ্রিকার নানা দেশ থেকে পাচার হওয়া দরিদ্র মানুষকে নিয়ে দাস-ব্যবসার রমরমা হচ্ছে (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ এপ্রিল ২০১৯)। উদ্বাস্তু মানুষের স্রোত আটকাতে মেক্সিকো সীমান্তে পাঁচিল তৈরি করতে একদিকে লক্ষ লক্ষ ডলার বরাদ্দ করছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট, অন্যদিকে লেভিস, ফোর্ড, নাইকে, জেনারেল মোটর্সের মতো দৈত্যাকার মার্কিন বহুজাতিক ও তাদের অধীনস্থ সংস্থাগুলির কারখানা বহাল তবিয়তে ব্যবসা করছে এই মেক্সিকো সীমান্তেই। মার্কিন মালিকরা মেক্সিকোর শ্রমিকদের কম মজুরিতে জঘন্য পরিবেশে খাটিয়ে নেয়। আউটসোর্সিং, চুক্তি ও ঠিকা শ্রমিক প্রথা পরিস্থিতি আরও ভয়ানক করে তুলছে। ন্যূনতম মজুরিটুকুও না দিয়ে কিংবা কোনওরকম সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা না রেখে কাজ করানো হয় যাদের, তারাও এক ধরনের দাসশ্রমিক, ভারতের মতো দেশে ব্যাপক সংখ্যায় যাদের দেখা মেলে। এমনকী তথ্যপ্রযুক্তির মতো তথাকথিত 'বড় চাকরি'র জায়গাতেও অন্যায্য মজুরি, বাধ্যতামূলক ওভারটাইম, সরকারি ছুটি ছাঁটাই ও কাজের জায়গার অস্বাস্থ্যকর অসুবিধাজনক পরিবেশ সহ চাকরির আরও নানা অন্যায় শর্ত কর্মচারীদের কার্যত দাস শ্রমিকে পরিণত করছে। সংবাদসূত্রে জানা যাচ্ছে, পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক দেশ চীন যা বর্তমানে একটি সাম্রাজ্যবাদী দেশ, সেখানে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে কর্মরত অনেকেরই অকালমৃত্যু ঘটছে। কারণ এই মানুষগুলিকে দীর্ঘ সময় ধরে অমানুষিক কাজের চাপ সহ্য করতে হচ্ছে। এদিকে চীনের সবচেয়ে বড় ই-কমার্স সংস্থার শতকোটিপতি মালিক তাঁর কর্মীদের জন্য সপ্তাহে ছয় দিন ধরে দিনে ১২ ঘন্টা করে কাজের আদেশ জারি করেছেন।

পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ আজকের দিনে শুধু নির্মম শোষণমূলক একটি ব্যবস্থা নয়, এই ব্যবস্থা চূড়ান্ত শয়তানিতে ভরা। শোষিত শ্রমজীবী মানুষ যাতে প্রতিবাদ করতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সমাজ থেকে সংস্কৃতি, নীতি-নৈতিকতা ধ্বংস করে নোংরামি, ভোগবাদ, চূড়ান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও সমাজবিমুখতা সৃষ্টি করে মানবিকতা ধ্বংসের সমস্ত রকম অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

শ্রমিকদের ক্ষমতা কাড়তে শ্রম আইন সংশোধন করা হচ্ছে

একই সঙ্গে পুঁজিবাদী শাসকদের প্রয়োজন খেটে-খাওয়া মানুষের চিন্তাপ্রক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটিয়ে তাদের চেতনার দিক দিয়ে নিরস্ত্র করে তোলা। সেই উদ্দেশ্যে প্রতিটি দেশেই তারা তথাকথিত 'অর্থনৈতিক সংস্কার'-এর গুণগান গাইছে। মিথ্যার জাল ছড়িয়ে তারা বলছে, সংস্কার হলে বিনিয়োগ বাড়বে, ফলে উন্নয়ন হবে। বাস্তবে সংগঠিত হওয়া, ধর্মঘট ডাকা কিংবা যৌথ দরকষাকষির মতো বহু সংগ্রামের দ্বারা অর্জিত অধিকারগুলি কেড়ে নিয়ে শ্রমিকদের নিরস্ত্র করে দেওয়ার আগ্রাসী অপচেষ্টা ছাড়া এ আর কিছু নয়। পাশাপাশি, এইসব সংস্কার একচেটিয়া ও বহুজাতিক সংস্থার মালিকদের সব ধরনের সুবিধা করে দিচ্ছে।

উদাহরণ হিসাবে ভারতের কথা উল্লেখ করা যায়। নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি পরিচালিত বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার একচেটিয়া কারবারিদের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি হিসাবে তথাকথিত সংস্কারের নামে অত্যন্ত কৌশলে শ্রমিকদের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনছে। এইসব সংস্কারের মধ্যে আছে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট্স অ্যাক্ট, ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট, ফ্যাক্টরিজ (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল ২০১৪, কন্ট্র্যাক্ট লেবার (রেগুলেশন অ্যান্ড অ্যাবোলিশন) অ্যাক্ট ইত্যাদি। এই পদক্ষেপ শ্রমিকদের অধিকার হরণ করার পাশাপাশি পুঁজিমালিকদের হাতে 'হায়ার অ্যান্ড ফায়ার' নীতি অর্থাৎ ইচ্ছামতো ছাঁটাই করার অধিকার তুলে দিয়েছে। এই সংস্কার এমনকী ফ্যাক্টরির সংজ্ঞা পর্যন্ত পাল্টে দিয়েছে যাতে আধুনিক প্রযুক্তি, আউটসোর্সিং, চুক্তিশ্রমিক প্রথা ইত্যাদির সাহায্য নিয়ে মালিকরা শ্রমিকের সংখ্যা কমাতে পারে। এভাবেই শ্রমিকদের সমস্ত আর্থিক দায়দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলতে পুঁজিপতিদের সাহায্য করছে এই সংস্কার নীতি। এক কথায় বলতে গেলে, প্রধান শ্রম আইনগুলির মাধ্যমে শ্রমিকরা এতদিন যেসব সুযোগ সুবিধা ভোগ করত সংস্কারের মধ্য দিয়ে সেগুলি ছাঁটাইয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ওয়েজ কোড বিল নামক একটি অদ্ভুত আইন আনারও চেষ্টা করছে এই সরকার। মিনিমাম ওয়েজেস অ্যাক্ট-১৯৪৮, পেমেন্ট অফ ওয়েজেস অ্যাক্ট-১৯৩৬, পেমেন্ট অফ বোনাস অ্যাক্ট-১৯৫৬ এবং ইকুয়াল রেমুনারেশন অ্যাক্ট-১৯৭৬— এই চারটি গুরুত্বপূর্ণ আইনের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তৈরি করা এই কোড বিলের সুপারিশ হল, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ন্যূনতম মজুরির হার বিভিন্ন রকম রাখা। এ আশঙ্কা অমূলক নয় যে, এই আইন চালু হলে প্রভু পুঁজিপতিদের খুশি করতে বিভিন্ন রাজ্যের বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া সরকারগুলি ন্যূনতম মজুরির হার কতটা কমানো যায়, তার প্রতিযোগিতায় নামবে। ১৯৫৭ সাল থেকে ইন্ডিয়ান লেবার কনফারেন্স ও সুপ্রিম কোর্টের একাধিক সুপারিশ সূত্র মান্য করে ভারত সরকার ন্যূনতম মজুরির হার বেঁধে দিতে বাধ্য। এর ভিত্তিতে বর্তমান সরকারেরই বসানো খোদ সপ্তম পে-কমিশন ১৮ হাজার টাকা ন্যূনতম মাসিক মজুরির সুপারিশ করেছে। তা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার মজুরির এই হার ওয়েজ কোড বিলের অন্তর্ভুক্ত করছে না। মালিকের সংস্থার হিসাবপত্র পরীক্ষা করার যে আইনি অধিকার শ্রমিক ও শ্রমিক সংগঠনগুলির রয়েছে, যা যৌথ দর-কষাকষির জন্য প্রয়োজন, প্রস্তাবিত কোড বিলে তা-ও না রাখার চক্রান্ত হচ্ছে। ফলে, এই বহুল প্রচারিত ওয়েজ কোড বিল খেটে-খাওয়া মানুষের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক এক অন্যায় আক্রমণ ছাড়া কিছু নয়।

শোষণের কালো মেঘের পিছনে আশার রুপালি রেখা

আজ পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ যখন তার সমস্ত নখ-দাঁত বের করে আক্রমণ করছে, তখন হতাশা ঝেড়ে ফেলে সংগ্রামী মানুষকে উঠে দাঁড়াতে হবে এবং এই অন্ধকার পরিস্থিতির পিছনে আশার রুপালি রেখার দিকে চোখ ফেরাতে হবে। কিন্তু তার আগে ইতিহাসের দিকে ফিরে দেখা জরুরি। দীর্ঘ সংগ্রাম, বহু ত্যাগস্বীকার ও শহিদদের আত্মদানের মধ্য দিয়ে শ্রমিক শ্রেণি ধর্মঘটের অধিকার সহ তাদের অন্যান্য অধিকারগুলি অর্জন করেছে। মে দিবসের ইতিহাস সেই সত্যেরই সাক্ষ্য দেয়। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন আইএলও-র আইনগুলি পায়ে মাড়িয়ে আজ শাসক পুঁজিপতি শ্রেণি সেগুলি কেড়ে নিতে চাইছে। তা সত্ত্বেও ব্যাপক শোষণ-বঞ্চনা-বিভ্রান্তির অন্ধকার কাটিয়ে আশার আলো উঁকি দিচ্ছে।

দিকে দিকে গড়ে উঠছে প্রতিবাদী গণআন্দোলন

সাম্প্রতিক অতীতে, বিশেষ করে গত এক দশকে শোষিত নিপীড়িত খেটে-খাওয়া মানুষ বার বার নিজের দেশের বুর্জোয়া, পেটি-বুর্জোয়া সরকারগুলির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তীব্র আন্দোলনে ফেটে পড়েছে। ২০১০ থেকে শুরু হয়ে ২০১১ ধরে এশিয়া-আফ্রিকা-ইউরোপ-আমেরিকা বার বার ভেসেছে সহস্র প্রতিবাদী জনতার আন্দোলনের স্রোতে। মিশরের তাহরির স্কোয়ার, টিউনিসিয়া, গ্রিসের সিনটাগমা স্কোয়ার, ফ্রান্সের নানা শহর, ইয়েমেন, আফ্রিকার আলজিরিয়া, মাদ্রিদের সেন্ট্রাল স্কোয়ার হয়ে নিউইয়র্কের টাইমস স্কোয়ার— ৮২টি দেশের দেড় হাজারের বেশি শহরে আছড়ে পড়েছে

ছয়ের পাতায় দেখুন

‘ভেবেছিলাম নোটায় দেবো, এখন ভাবছি আপনাদের কথাই’

জেলায় জেলায় দলের হাজার হাজার কর্মী এপ্রিল মাসের তীব্র রোদ মাথায় নিয়ে সারা দিন রাস্তার মোড়ে, বাজারে, স্টেশনে, ট্রেনে সর্বত্র কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে মানুষের হাতে পৌঁছে দিচ্ছেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের ‘জনস্বার্থে নির্বাচনকে কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে হবে’ বইটি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অক্লান্ত পরিশ্রমে পথচলতি শত-সহস্র মানুষকে বুঝিয়ে কর্মীদের বইটি বিক্রি করতে দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছেন মানুষ। বই হাতে নিয়ে তাঁরা জিজ্ঞেস করছেন, কীসের জোরে এত পরিশ্রম আপনারা হাসিমুখে করতে পারেন! আদর্শ প্রচারের জন্য আর কোনও দলকে তো এত পরিশ্রম করতে দেখি না। কী পান এতে আপনারা? কর্মীরা বিনয়ের সাথে উত্তর দিচ্ছেন, সত্য প্রতিষ্ঠার, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে অংশগ্রহণের তৃপ্তি। তাঁরা বলছেন, সে তো স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবীরা করতেন। কর্মীরা আবার উত্তর দেন, স্বাধীনতা আন্দোলনে বিদেশি শাসনের হাত থেকে মুক্ত হয়েছে দেশ। এখন দেশীয় শাসক শ্রেণির দ্বারা শোষিত-লুণ্ঠিত হচ্ছে। তখন শত্রু ছিল বিদেশি সাম্রাজ্যবাদ, তাকে চেনা যেত সহজে। আজ শাসক হিসাবে যারা শোষণ-লুণ্ঠন চালাচ্ছে তারা দেশেরই একদল মানুষ। শত্রু হিসাবে তাদের চেনা অনেক কঠিন। তাদের বিরুদ্ধে লড়াইটাও তাই কঠিন।

পশ্চিম মেদিনীপুরে দলের কর্মীরা একটি স্কুলের স্টাফরুমে গিয়ে বইটি শিক্ষকদের পড়ে দেখার জন্য আবেদন করেন। একজন শিক্ষক একটি বই নিয়ে পড়তে শুরু করেন, অন্যেরা শুনতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর একজন শিক্ষিকা বাকি অংশ পড়েন। প্রধান শিক্ষক সহ সব শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী বইটি কেনেন এবং বলেন, একমাত্র আপনারাই সারা বছর মানুষের মধ্যে থাকেন।

ঝাড়গ্রামের এক যুবক বইটি পড়ার পর এক কর্মীকে ডেকে বলেন, রাজনীতির নামে চুরি-দুর্নীতি আর নোংরামি দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে এবার ভেবেছিলাম, কাউকে নয়, এবার ভোটটা নোটায় দেবো। কিন্তু প্রভাস ঘোষের লেখা বইটি পড়ার পর বহু জিনিস আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। এখন সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ভোটটা আপনাদেরই দেবো। একই রকম ভাবে আর একজন যুবক বইটি পড়ে বললেন, সিপিএম-তৃণমূলের প্রতি বিরক্ত হয়ে ভেবেছিলাম এবার ভোটটা বিজেপিকে দেবো। বইটি পড়ে আমার সিদ্ধান্ত পাল্টেছি। আমার সমর্থন আপনারাই পাবেন।

কর্মীদের পরিশ্রম দেখে বহু মানুষ অবাক হচ্ছেন। তাঁদের ডেকে নিয়ে চা-টিফিন খাওয়াচ্ছেন। দক্ষিণ কলকাতার হরিদেবপুরে বই বিক্রি করছিলেন দলের কর্মীরা। দুই ভদ্রলোক চায়ের দোকানে বসে অনেকক্ষণ দেখছিলেন আর মাঝে মাঝে নানা প্রশ্ন করছিলেন। একজন এক-ছাত্রী কর্মীকে ডেকে বললেন, আচ্ছা বলুন তো, রাজ্যে কংগ্রেস সিপিএম তো প্রায় অস্তিত্বহীন। লড়াই তো প্রায় দ্বিমুখী। কী হবে বলে মনে হয়? কর্মীটি বললেন, দেখুন, এ বাংলা নবজাগরণের উদগাতা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুলের বাংলা। ক্ষুদিরাম, মাস্টারদা, বিনয়-বাদল-দীনেশ, নেতাজির কর্মভূমি। বামপন্থী আন্দোলনের দীর্ঘ ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। এখানে একটা সাম্প্রদায়িক, ফ্যাসিস্ট দলের কখনও জায়গা হতে পারে না। মানুষ তাদের কোনও ভাবেই গ্রহণ করবে না। তিনি বললেন, তা হলে কাকে ভোটটা দেবো? পাশে বসা অপর ব্যক্তি বললেন, তুমি তো একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করলে। ওনারা এ রাজ্যে ৪২টা আসনেই লড়ছেন। উনি তো চাইবেনই তুমি ওদেরই ভোটটা দাও। কর্মীটি উত্তর দিলেন, কাকু, আপনি তো এখনই বলছিলেন আপনি সব সময়ই কোথাও না কোথাও আমাদের দেখেন আন্দোলন করতে, পুলিশের মার খেতে। তা হলে যারা সারা বছর মানুষের জন্য লড়াই করে তারাই তো আপনার সমর্থনের সত্যিকারের দাবিদার। তিনি হেসে সবাইকে চা-টিফিন খেতে বললেন। কর্মীটি যখন বললেন, আমরা তো অনেকেই রয়েছি, আমরাও খরচের কিছুটা শেয়ার করি। তিনি হেসে বললেন, না, থাক। তোমরা জনগণকে দেখো, আমরা তোমাদের দেখি। তারপর বইটি নিয়ে ঠিকানা দিলেন। বাড়িতে যেতে বললেন।

এক জায়গায় কর্মীরা বই বিক্রি করছিলেন। বাইকে চড়ে এক যুবক এসে দাঁড়ালেন। সামনের যুব-কর্মীটির দিকে তাকিয়ে বললেন, কী ভাবছেন আপনারা? লক্ষ্য কী আপনাদের? কর্মীটি হেসে জবাব দিলেন, বিপ্লব। তিনিও হাসলেন। বললেন, অবশ্যই, বামপন্থীদের তো এটাই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। বিপ্লবই তো স্বপ্ন হওয়া উচিত। কর্মীটি বললেন, কোনও বুর্জোয়া দলের লেজুড়বৃত্তি না করে, কটা সিটে জিতব এই ভাবনা না ভেবে, সমাজ পরিবর্তনটাই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। যুবক বললেন, এ ব্যাপারে আমি আপনার সাথে একমত। বইটি নিয়ে বাড়ির ঠিকানা দিয়ে বললেন, এক সময় কলকাতার চারুচন্দ্র কলেজে এসএফআই করতাম। বুঝেছি, ওরা কিছু করবে না। আপনারাই ঠিক।

রানাঘাট স্টেশনে তীব্র রোদের মধ্যে দলের এক সংগঠক একাই বই বিক্রি করছেন। এক যুবককে বইটি নেওয়ার কথা বলতেই তিনি হাসলেন। বললেন, হাসি দেখে অন্য কিছু ভাববেন না। আমি আপনাকে আধ ঘণ্টা ধরে লক্ষ করছি। আমি এক সময় শাসক বামপন্থী দলের কর্মী ছিলাম। কিন্তু আপনাদের সম্পর্কে শ্রদ্ধা ছিল। আজ সেই শ্রদ্ধা আরও অনেক বেড়ে গেল। বইটি নিয়ে দলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কথা বলে গেলেন।

মধ্য কলকাতায় একটি বাজারের সামনে কর্মীরা বই বিক্রি শুরু করার একটু পরেই বাজার সমিতির সঙ্গে যুক্ত এক ভদ্রলোক একটি হিন্দি বই নিয়ে গিয়েছিলেন। ঘণ্টা তিনেক পরে কর্মীরা যখন বইপত্র গোটাচ্ছেন, তখন সেই ব্যক্তি ফিরে এসে বললেন, আর বই আছে? কর্মীরা একটি বই এগিয়ে দিতেই বললেন, আমাকে চারটে বই দিন। এক কর্মী জিজ্ঞেস করলেন, বইগুলি কাদের দেবেন? উত্তরে বললেন, আমাদের খোঁজটোঁজ নিয়ে লাভ নেই। আমরা সব এখানকার পরিচিত লাল লোক। বইগুলো কিছু জনকে দেবো। বেশি কথা এখানে বলতে পারবো না। তারপর নাম, ফোন নম্বর দিয়ে গেলেন।

এক শিক্ষিকা বইটি পড়ে দলের সঙ্গে যুক্ত অন্য এক শিক্ষককে ফোন করে বলেছেন, রাজনীতি বলতে এতদিন বুঝতাম শুধু ভোট। প্রভাসবাবুর বইটি পড়ে নতুন করে শিখলাম রাজনীতি কী। কলেজ স্ট্রিটের এক বইয়ের দোকানদার বললেন, খবরের কাগজ আর টিভিতে বড় বড় দল আর নেতাদের প্রচারে সব গুলিয়ে যাচ্ছিল। বইটি পড়ে একটি সঠিক গাইডলাইন পেলাম। বইটি বিভিন্ন ভাষায় লক্ষ লক্ষ কপি ছাপা হয়েছে শুনে বললেন, এই বই কোটি কোটি ছেপে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া দরকার।

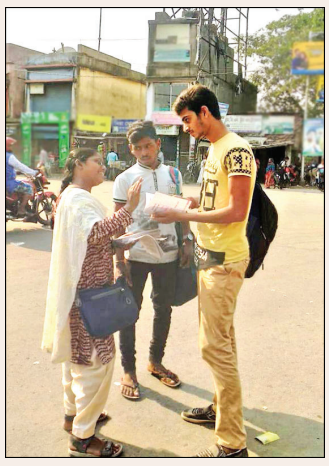

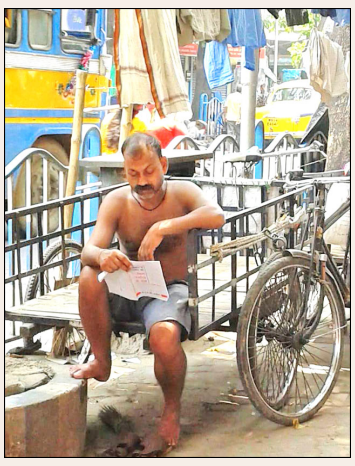

রাজ্য জুড়ে চলছে বই বিক্রি। কাজের ফাঁকে বইটি পড়ে ফেলছেন এক শ্রমজীবী মানুষ

ভয়াবহ খরার কবলে কর্ণাটক

বছরের পর বছর দেশের মধ্যে খরা কবলিত রাজ্য হিসাবে সর্বোচ্চ স্থান দখল করে রেখেছে কর্ণাটক। পরিস্থিতি এতটাই ভয়ঙ্কর যে, ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনে সমস্ত প্রধান বুর্জোয়া দলগুলি তাদের নির্বাচনী ইস্তাহারে কৃষকদের এই সমস্যা সমাধান করার প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হয়েছিল, যদিও তা ছিল নিছক নির্বাচনী স্বার্থে। ক্ষমতায় আসার পরে জেডি (এস)-কংগ্রেস জোট কৃষকদের বৃহৎ পরিমাণ ঋণ মকুব করার ঘোষণা করে। কিন্তু রাজ্যে বিপুল সংখ্যক কৃষক এবং তাদের চূড়ান্ত দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় ঋণ মকুব এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পারেনি। আর এক হতাশাজনক ঘটনা হল, ঋণ মকুবের সুযোগও কৃষকের কাছে পৌঁছয়নি বহু ক্ষেত্রে। এই রকম একটা পরিস্থিতিতে সাম্প্রতিক খরা সংকটে জর্জরিত কৃষকদের সমস্যার আগল আরও খুলে গেল।

কৃষকদের এই সমস্ত সমস্যার সমাধান করার পরিবর্তে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ‘অন্যেরা অবহেলা করছে’ বলে পরস্পর কাদা ছোড়াছুড়িতে নেমে পড়ল। রাজ্য সরকার যখন কেন্দ্রকে নিশানা করে কৃষক সমস্যার সমাধানে অবহেলার জন্য তাদের দোষারোপ করছে, সেই সময় বিজেপিও ‘কর্ণাটক সরকার কিছুই করেনি’ এই অভিযোগ আনার সুযোগ ছাড়েনি। অবশ্য এরও বাস্তবতা রয়েছে যে, বিজেপি শাসিত রাজ্য যেমন মহারাষ্ট্র, অ-বিজেপি শাসিত রাজ্য কর্ণাটকের প্রতি ক্ষমাহীন জঘন্য বৈষম্যমূলক রাজনীতি চালিয়ে যাচ্ছে।

রাজ্যের ৪৭টি শহর এবং ৬২৫টি গ্রামের বাসিন্দা কাবেরী নদীর উপর নির্ভরশীল তাদের নিত্যব্যবহার্য জলের জন্য। কারণ, রিজার্ভারে জলের মাত্রা প্রয়োজনের তুলনায় কম। কর্ণাটক স্টেট ন্যাচারাল ডিজাস্টার মনিটরিং সেন্টারের ডিরেক্টর সংবাদমাধ্যমে বলেছেন, ‘বাঁধগুলিতে প্রায় ৪১ টিএমসি (থাউস্যান্ড মিলিয়ন কিউবিক) জল রয়েছে, বর্তমানে পানের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণে জল রয়েছে। সরকার সমস্ত বাঁধ কর্তৃপক্ষকে পানীয় জল মজুত করার নির্দেশ দিয়েছে। এর পরেও বাড়তি জল থাকলে তবে তা সেচের জন্য খরচ করার কথা’। তিনি বলেন, ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৃষ্টি কম হওয়ার ফলে বেঙ্গালুরু, মহীশূর এবং অন্য ৪৭টি শহর ও ৬২৫টি গ্রামে রিজার্ভারে জল ছিল না। তারা কাবেরী নদীর উপর নির্ভরশীল ছিল। ২০১৭ সালে কর্ণাটকের ১২টি বাঁধের ৯টি বাঁধে ২০ শতাংশের কম জল থাকায় অনুরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। উত্তর কর্ণাটকের অবস্থা আরও ভয়াবহ।

গত দু’বছরে বর্ষার পরে ও আগে একই ঘটনা ঘটছে। কৃষকরা রাষ্ট্রায়ত্ত ও কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক থেকে ধার নিতে বাধ্য হয়, যা পরে বিশাল ঋণে পর্যবসিত হয়। রাজ্য সরকার কম পরিমাণে ঋণ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়াতেই সীমাবদ্ধ থাকে, যা শুধুমাত্র কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কেই পাওয়া যায়। সরকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক গোশালা তৈরি এবং পশুখাদ্য ও জল দিতে ব্যর্থ। উপরন্তু, সরকার এমরেগা প্রকল্পে ১৮০ দিনের কাজ দিতে পারেনি শুধু তাই নয়, ২-৩ মাসের বকেয়া মাইনেও দেওয়া হয়নি প্রকল্পের কর্মীদের। পানীয় জলের চূড়ান্ত অভাবে পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যায়। সে কারণে হাজার হাজার কৃষক আত্মীয়-পরিজন নিয়ে গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়ে পাগলের মতো কাজ খুঁজে বেড়াতে বাধ্য হন। ভারতীয় আবহবিদ্যা বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে ১-১২ জুন মোট বৃষ্টিপাত কমেছে ২ শতাংশ। উপকূলবর্তী এলাকায় স্বাভাবিকের তুলনায় ৩ শতাংশ, দক্ষিণের প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাভাবিকের তুলনায় ৭ শতাংশ, উত্তরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ২৬ শতাংশ কম বৃষ্টিপাত হয়েছে।

২০১৮-’১৯ এর খরিফ ও রবি শস্যের সময় কম বৃষ্টিপাতের কারণে মারাত্মক জলসংকট দেখা দেওয়ায় কৃষকদের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে ওঠে। ১৭৬টি তালুকের মধ্যে ১৫৬টিতে এই পরিস্থিতি হওয়ায় সরকার এগুলিতে ‘ভয়ঙ্কর ও বিধ্বংসী’ খরাপ্রবণ বলে

সাতের পাতায় দেখুন

ভোটের প্রচারে প্রার্থী ও দলের কর্মীরা

▲ মনোনয়ন জমা দিতে চলেছেন ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী সুশীল মাণ্ডী

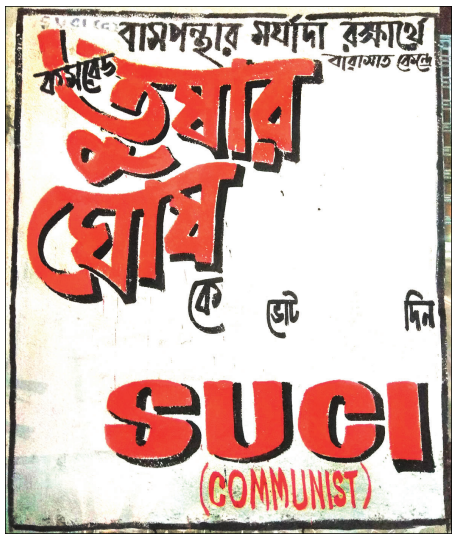

▲ বারাসাত কেন্দ্রের প্রার্থী তুষার ঘোষের প্রচারে দেওয়াল লিখন

মনোনয়ন দাখিল এসইউসিআই (সি) প্রার্থীদের

সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে পাঁচটি জেলা নির্বাচনের মনোনয়নের বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার পর প্রথম দিন মনোনয়ন দাখিল করেন এস ইউ সি আই (সি) দলের প্রার্থীরা। দলের মেদিনীপুর ও ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী তুষার জানা ও দীনেশ মেইকাপ প্রথম দিনে পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশাসকের দপ্তরে নমিনেশন জমা দেন। প্ল্যাকার্ড-ফেস্টুন হাতে মিছিল সহকারে প্রার্থী সহ দলের কর্মী-সমর্থকেরা জেলাশাসক দপ্তরে যান প্রার্থীর মনোনয়ন দাখিল করতে।

এক যৌথ বিবৃতিতে তাঁরা বলেন, 'গণআন্দোলনকে মূল লক্ষ্য করেই আমরা ভোটে লড়ছি। আমরা সারা বছর জনগণের নানা জ্বলন্ত সমস্যা সমাধানের দাবিতে যেমন আন্দোলন করে থাকি, সেই আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার জন্যই জনগণের কাছে আমাদের ভোট চাওয়া।'

উপস্থিত ছিলেন দলের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক নারায়ণ অধিকারী, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অমল মাইতি, জেলা নেতৃবৃন্দ সহ আরও অনেকে। ওই একই দিনে সুসজ্জিত মিছিল করে জেলা নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে মনোনয়ন জমা দেন আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী অমর চৌধুরী, বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী অজিত বাউরি, বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী তন্ময় মণ্ডল।

◄ আসানসোল কেন্দ্রের প্রার্থী অমর চৌধুরী মনোনয়ন জমা দিতে চলেছেন

মনোনয়ন জমা দিতে চলেছেন বিষ্ণুপুর কেন্দ্রের প্রার্থী অজিত বাউরি এবং বাঁকুড়া কেন্দ্রের প্রার্থী তন্ময় মণ্ডল

অন্যান্য রাজ্যের প্রার্থী সংখ্যা

ওড়িশা	৮
আসাম	৬
বিহার	৮
উত্তরপ্রদেশ	৪
ছত্তিশগড়	৩
দিল্লি	২
গুজরাট	২
হরিয়ানা	৪
ঝাড়খণ্ড	৫
কর্ণাটক	৮
কেরালা	৯
তামিলনাড়ু	৪
অন্ধ্রপ্রদেশ	২
তেলেঙ্গানা	২
মধ্যপ্রদেশ	৩
মহারাষ্ট্র	১
পাঞ্জাব	১
রাজস্থান	১
ত্রিপুরা	১
উত্তরাখণ্ড	১
পুদুচেরি	১
বিধানসভায় প্রার্থী	
ওড়িশা	২৪
অন্ধ্রপ্রদেশ	৩

রাজ্যের ৪২টি আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে এস ইউ সি আই (সি)

১. কোচবিহার	প্রভাত রায়
২. আলিপুরদুয়ার	রবিচন রাভা
৩. জলপাইগুড়ি	হরিভক্ত সরদার
৪. দার্জিলিং	তন্ময় দত্ত
৫. রায়গঞ্জ	সুজনকৃষ্ণ পাল
৬. বালুরঘাট	বীরেন মহন্ত
৭. মালদা উত্তর	সুভাষ সরকার
৮. মালদা দক্ষিণ	অংশুধর মণ্ডল
৯. জঙ্গিপুর	সামিরুদ্দিন
১০. বহরমপুর	আনিসুল আম্বিয়া
১১. মুর্শিদাবাদ	বকুল খন্দকার
১২. কৃষ্ণনগর	সেখ খোদাবক্স
১৩. রানাঘাট	পরেশচন্দ্র হালদার
১৪. বনগাঁ	স্বপন মণ্ডল
১৫. ব্যারাকপুর	প্রদীপ চৌধুরী
১৬. দমদম	তরুণ দাস
১৭. বারাসাত	তুষার ঘোষ
১৮. বসিরহাট	অজয় বাইন
১৯. জয়নগর	জয়কৃষ্ণ হালদার
২০. মথুরাপুর	পূর্ণচন্দ্র নাইয়া
২১. ডায়মন্ডহারবার	অজয় ঘোষ
২২. যাদবপুর	সুজাতা ব্যানার্জী
২৩. কলকাতা দক্ষিণ	দেবব্রত বেরা
২৪. কলকাতা উত্তর	বিজ্ঞান বেরা
২৫. হাওড়া	মহঃ শানাওয়াজ
২৬. উলুবেড়িয়া	মিনতি সরকার
২৭. শ্রীরামপুর	প্রদ্যুৎ চৌধুরী
২৮. হুগলি	ভাস্কর ঘোষ
২৯. আরামবাগ	প্রশান্ত মালিক
৩০. তমলুক	মধুসূদন বেরা
৩১. কাঁথি	মানস প্রধান
৩২. ঘাটাল	দীনেশ মেইকাপ
৩৩. ঝাড়গ্রাম	সুশীল মাণ্ডি
৩৪. মেদিনীপুর	তুষার জানা
৩৫. পুরুলিয়া	রঙ্গলাল কুমার
৩৬. বাঁকুড়া	তন্ময় মণ্ডল
৩৭. বিষ্ণুপুর	অজিত বাউরি
৩৮. বর্ধমান পূর্ব	নির্মল মাঝি
৩৯. বর্ধমান-দুর্গাপুর	সুচেতা কুণ্ডু
৪০. আসানসোল	অমর চৌধুরী
৪১. বোলপুর	বিজয় দলুই
৪২. বীরভূম	আয়েষা খাতুন

হাওড়া লোকসভা কেন্দ্রে প্রচারে ▼ প্রার্থী মহম্মদ শানাওয়াজ

মে দিবসের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা পাবেই

তিনের পাতার পর

বিক্ষোভের ঝড়। সর্বত্রই বিক্ষুব্ধ মানুষ ফুঁসে উঠেছে ভয়ঙ্কর বেকারি, আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, ব্যয়সঙ্কোচের অজুহাতে শিক্ষা, চিকিৎসা, পেনসন ইত্যাদির মতো সমাজকল্যাণমূলক খাতগুলিতে সরকারি বরাদ্দ ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে। বহু জায়গায় বিক্ষোভ হয়েছে গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ, রাজনৈতিক দমন-পীড়ন, ব্যাপক দুর্নীতি ও পুলিশি বর্বরতার প্রতিবাদে। এভাবেই মানবসভ্যতার সবচেয়ে বড় শত্রু সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট দুর্নীতিগ্রস্ত ও স্বৈরাচারী প্রেসিডেন্টদের দশকের পর দশক ধরে চলতে থাকা অপশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে টিউনিসিয়া ও মিশরের মানুষ। ফ্রান্সের জনগণ লড়েছে তাদের সরকারের প্রস্তাবিত নতুন শ্রম-আইনের বিরুদ্ধে, যে আইন চালু করে শ্রমিকদের বহু কষ্টার্জিত অধিকার কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র করছিল সে দেশের সরকার।

কিছুদিন আগেই মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা উত্তাল হয়ে উঠেছিল জঙ্গি 'আরব বসন্ত' আন্দোলনে। সেখানকার মানুষের ক্ষোভ ফেটে পড়েছিল নিজের নিজের দেশের শাসকদের স্বৈরাচার ও আমেরিকা সহ অন্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অন্যায় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে। গ্রিস, ইটালি, স্পেন, পর্তুগাল, ফ্রান্স, জার্মানি, ব্রিটেন সহ ইউরোপের দেশে দেশে আন্দোলন হয়েছে। সর্বত্রই মহামন্দার ধাক্কায় টলতে থাকা দেশের অর্থনীতি রক্ষা করতে সরকারি ব্যয়সঙ্কোচের নীতি, যা মানুষের জীবনযাত্রা দুর্বিষহ করে তুলেছে, তার বিরুদ্ধে রোষ আছড়ে পড়েছে। প্রতিবাদ আন্দোলন বহু জায়গায় ব্যারিকেড লড়াইয়ের রূপ নিয়েছে। এই সময়ে আমেরিকার নিউইয়র্কে ঘটেছে প্রখ্যাত 'অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট' আন্দোলন। ২০১১ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর শুরু হওয়া এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন হাজার হাজার মানুষ। মাসের পর মাস ধরে অবস্থান চালিয়ে গেছেন তাঁরা। স্লোগান তুলেছেন, 'আমরা ৯৯ শতাংশ মানুষ ১ শতাংশের লোভ আর দুর্নীতি সহ্য করব না', 'আমেরিকায় গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে মিশর, গ্রিস, স্পেন ও আইসল্যান্ডে আন্দোলনকারী ভাই-বোনদের মতো আমরাও আন্দোলনে নেমেছি'।

বিশ্বের দেশে দেশে ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়া এই আন্দোলন খুব স্বাভাবিক ভাবেই দুনিয়ার খেটে-খাওয়া মানুষের বুকে বিরাট আশার সঞ্চার করেছিল। গণআন্দোলন ও সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে আমাদের দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) এই আন্দোলনগুলির প্রতি অভিনন্দন জানিয়েছিল। কিন্তু সাথে সাথে এই সতর্কবাণীও দল উচ্চারণ করেছিল যে, পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লব গড়ে তোলার দায়িত্ব ঐতিহাসিক ভাবে যে শ্রমিক শ্রেণির উপর ন্যস্ত, তাদের সর্বব্যাপী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজের নিজের দেশে বিপ্লবী দল গড়ে তুলতে হবে। কারণ একমাত্র প্রকৃত কমিউনিস্ট নেতৃত্বই মেহনতি মানুষকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তুলতে পারে, যার দ্বারা তারা গণআন্দোলনকে সঠিক পরিণতিতে নিয়ে যেতে পারে। দুঃখের বিষয়, ইতিহাস নির্ধারিত এই দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হওয়ার সুযোগ শেষপর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদীরাই নিয়েছে।

মানবসভ্যতার ইতিহাস থেকে দেখা যায়, সমাজপরিবর্তনের অমোঘ নিয়ম অনুসরণ করে ভবিষ্যতে দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথে ব্যর্থতা কখনওই বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। তাই এক দশক পরে আবার বিশ্বের নানা প্রান্তে আবার ব্যাপক আন্দোলনের স্পন্দন লক্ষ করা যাচ্ছে। সমাজের নানা স্তরের মেহনতি মানুষ আবার এককাট্টা হচ্ছেন আরও দীর্ঘস্থায়ী, আরও সংগঠিত আন্দোলনে। স্পেনের পেনশনভোগীরা হাজারে হাজারে সমবেত হয়ে এক বছরের বেশি সময় ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। ফ্রান্সের 'ইয়েলো ভেস্ট' আন্দোলন চলছে টানা ২২ সপ্তাহ ধরে। এই আন্দোলনে সামিল হয়েছেন গ্রাম, শহর, মফস্‌সলের শ্রমিক, কৃষক, অফিস কর্মচারী, ছাত্র এমনকী গৃহবধূরা পর্যন্ত। ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক নিপীড়ন ও পড়তে থাকা জীবনযাত্রার মানের প্রতিবাদে রাশিয়ার নানা শহরে ২৩ মার্চ বিক্ষোভ দেখিয়েছেন হাজার হাজার মেহনতি মানুষ। কয়েক মাস আগে সেখানকার পুতিন সরকারের চালু করা পেনশন সংস্কারের বিরুদ্ধেও ব্যাপক প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল।

অন্য দিকে আমেরিকার নানা শহরে শিক্ষার দাবিতে এবং কম মজুরি, চাকরির কঠিন শর্ত, দামবৃদ্ধি ইত্যাদির বিরুদ্ধে মার্কিন জনতা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। লস অ্যাঞ্জেলেস শহরে ৩০ হাজারের বেশি পাবলিক স্কুলের শিক্ষক ধর্মঘট করেছেন। ২০১৯-এর মার্চ-এপ্রিল মাসে ফিলাডেলফিয়া, মায়ামি, শিকাগো, ওহিও ইত্যাদি শহর সাক্ষ্য থেকেছে বহু আন্দোলনের। নর্থ ক্যারোলিনায় এক বছরের বেশি সময় ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন মানুষ। পুঁজিবাদী বিশ্বের ইঞ্জিন বলে কথিত আমেরিকায় বেকারির হার ঊর্ধ্বমুখী, ৬ জনের মধ্যে একজন মার্কিন নাগরিক দারিদ্রসীমার নিচে বাস করেন। ধর্মঘটরত এক গাড়ি-ড্রাইভার দুঃখ করে বলেছেন, "আজ আমি গৃহহারা ... প্রয়োজনমতো রোজগার আমার নেই। সমস্যার জালে জড়িয়ে গেছি, বেরোবার পথ জানা নেই"। 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন'-এর এক ছাত্র মন্তব্য করেছেন, "পড়ার খরচ মিটিয়ে দেওয়ার পর হাতে আর কিচ্ছু থাকে না। খাবার কেনার পয়সা নেই, ঘরভাড়া দেওয়ারও না"।

মেক্সিকোতে, টেক্সাসে মার্কিন সীমান্তের কাছে ৪৫ হাজার শ্রমিক বেশ কয়েকটি কারখানার চাকা কার্যত বন্ধ করে রেখেছিলেন। রাস্তার মোড়ে প্রতিদিন বিশাল জনতার সমাবেশ হত। লক্ষণীয় হল, মূলত অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া নিয়ে লড়লেও, শ্রমিকরা বুঝতে পেরেছেন শুধু নিজের নিজের কারখানার শ্রমিকদের নিয়ে নয়, সমস্ত মেহনতি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দীর্ঘস্থায়ী লড়াই চালাতে হবে। দেশের দুটি শ্রমিক সংগঠন, কয়েকটি বামপন্থী গোষ্ঠী এবং প্রায় ৬০টি সামাজিক-রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃত্বে আর্জেন্টিনার হাজার হাজার নারী-পুরুষ মার্চ মাসে মশাল হাতে পথে নেমেছিলেন গ্যাস, বিদ্যুৎ, জল ও পরিবহণ পরিষেবার দামবৃদ্ধির বিরুদ্ধে।

বিশ্ব জুড়ে সংগ্রামী মানুষ বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলছেন

এগুলি হল গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা অজস্র দৃষ্টান্তের কয়েকটি, যেগুলি অনুপ্রেরণা দেয়। পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শোষণ যত চূড়ান্ত নগ্ন রূপ নিচ্ছে, মানুষ চুপচাপ তা বরদাস্ত করছে না, তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছে। ফলে, সমাজতন্ত্রের সাময়িক বিপর্যয়ের পরেও হতাশাকে জয় করে মানুষ আবারও সংঘবদ্ধ হচ্ছে, সংগঠিত হচ্ছে। মাসের পর মাস এমনকী বছরের পর বছর ধরে আন্দোলন চলছে। এই উদ্যম ও উৎসাহ প্রতিফলিত হচ্ছে মে দিবস উদযাপনেও। মে দিবস উপলক্ষ্যে জনজীবনের বিভিন্ন দাবি নিয়ে, শ্রমিকের অধিকার রক্ষার দাবি নিয়ে কিউবার হাভানায়, রাশিয়ার মস্কোয়, এশিয়া-ইউরোপের শহরগুলিতে বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হচ্ছেন হাজার হাজার শ্রমজীবী মানুষ। এই জনজোয়ার মে দিবসের যথার্থ মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে অত্যুজ্জ্বল রূপালি রেখার মতো।

উদাহরণ স্বরূপ, ফ্রান্সের জনগণ কেবল মাসের পর মাস ধরে আন্দোলনই চালাচ্ছে না, বরং স্লোগান তুলছে 'পুঁজিবাদ নিপাত যাক'। এও পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, সেখানকার বিভিন্ন বামপন্থী গোষ্ঠীও শ্রমজীবী নারী-পুরুষের ঐক্যকে সুদৃঢ় করার উদ্যোগ নিচ্ছে গণআন্দোলনকে জোরদার করার জন্য। তারা বুঝতে পারছে যে, বামপন্থীদের সবসময়ই জনগণের সাথে থাকা কর্তব্য। রাশিয়ার পরিস্থিতি এখন এতটাই খারাপ যে সেখানকার দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ সোভিয়েতের পতনের জন্য আক্ষেপ করছেন। মহান লেনিন-স্ট্যালিনের ছবি হাতে নিয়ে রাশিয়ার পথে-পথে জনতার ঢল নামছে সমাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আকাঙক্ষায় (পিপল'স্ ডেসপ্যাচ— পাবলিশড বাই নিউজ ক্লিক, ২৮ মার্চ ২০১৯)।

তাই, এই হল সময় যখন গোটা বিশ্বের সংগ্রামী জনতার প্রয়োজন যথার্থ রাজনৈতিক সচেতনতা। এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, ব্যাপক জঙ্গি আন্দোলনও শোষণ-অত্যাচার বিলোপ করার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হতে পারে। সে-কারণে সশস্ত্র রাষ্ট্রের পৈশাচিক আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রয়োজন যথার্থ বিপ্লবী নেতৃত্ব। সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের এই যুগে সেই নেতৃত্ব একমাত্র দিতে পারে একটি প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি, যে পার্টি মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে জীবনদর্শন হিসেবে গ্রহণ করেছে।

এই উপলব্ধির ভিত্তিতে যেদিন শ্রমিকশ্রেণি উঠে দাঁড়াবে সেদিন আর মে দিবসের মহান গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহাসিক ঐতিহ্যকে গোটা বিশ্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে কোনও বাধা ও বিভ্রান্তি থাকবে না। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বৈজ্ঞানিক দর্শনে সমৃদ্ধ জনগণ দৃঢ় ভাবে জানে, বিপ্লব অনিবার্য। জনসাধারণ যত দ্রুত এই সত্য উপলব্ধি করবে, ততই আসন্ন হবে তাদের শোষণমুক্তির ভোর।

জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জের গ্রেফতারির নিন্দায় ইকুয়েডরের কমিউনিস্ট পার্টি

সম্প্রতি ব্রিটিশ পুলিশ লন্ডনে ইকুয়েডরের দূতাবাস থেকে গ্রেপ্তার করেছে উইকিলিক্স খ্যাত জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জেকে। কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ এই সাংবাদিক অসংখ্য ই-মেল ও ভিডিও ফুটেজ ফাঁস করে দিয়ে ২০১০ সাল নাগাদ আফগানিস্তান ও ইরাকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নির্মম বর্বরতার গোপন খবর গোটা বিশ্বের চোখের সামনে নিয়ে আসেন। সেই থেকে অ্যাসাঞ্জে মার্কিন শাসকদের বিষনজরে। প্রাণ বাঁচাতে বিভিন্ন দেশের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন তিনি। শেষ পর্যন্ত প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রাফায়েল কোরেয়ার আমলে ইকুয়েডরে তাঁর আশ্রয় মেলে।

এক বিবৃতিতে অ্যাসাঞ্জের গ্রেফতারির তীব্র নিন্দা করেছে ইকুয়েডরের মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট কমিউনিস্ট পার্টি। দেশের বর্তমান প্রেসিডেন্ট লেনিন মোরেনোর কার্যকলাপের সমালোচনা করে তারা বলেছে, জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জের গ্রেফতারির ঘটনায় প্রেসিডেন্ট মোরেনো জমানার আসল চেহারা সামনে এল, যার বৈশিষ্ট্য হল গ্রেট ব্রিটেন ও আমেরিকার মতো সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির কাছে সম্পূর্ণ নতিস্বীকার করে তাদের সঙ্গে প্রকাশ্য ও গোপন বোঝাপড়ায় গিয়ে জাতীয় সার্বভৌমত্ব, মানবাধিকার ও রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীদের অধিকার ধ্বংস এবং সরকারি নীতির বিরোধীদের প্রতি প্রতিহিংসামূলক আচরণ করা।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ব্রিটিশ পুলিশকে ইকুয়েডরের দূতাবাসে প্রবেশ করার অনুমতি দিয়েছে মোরেনো সরকার, যাতে তারা জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জেকে গ্রেফতার করতে পারে। স্মরণ করা দরকার, অস্ট্রেলীয় এই মানুষটি ই-মেল সহ নানা কম্পিউটার-বার্তা 'হ্যাক' করে, দুনিয়া জুড়ে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নানা গোপন কার্যকলাপ বিশ্বের মানুষের সামনে ফাঁস করে দিয়েছেন। এই কারণেই তাঁকে হত্যা ও গ্রেফতারির ভয়ঙ্কর হুমকির মুখে পড়তে হয়েছে।

তাঁরা বলেছেন, সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে এক প্রতিরোধহীন হ্যাকারকে তুলে দেওয়ায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের পাশাপাশি রাজনৈতিক আশ্রয়লাভের অধিকারটিও পদদলিত হল এবং তা চাপা দিতেই ইকুয়েডর সরকার এখন অ্যাসাঞ্জের নামে অভিযোগ তুলছে যে তিনি প্রেসিডেন্ট মোরেনো ও তাঁর পরিবারের বেআইনি ব্যবসার সমালোচনা করে রীতি ভেঙেছেন। অথচ প্রেসিডেন্টের এই সন্দেহজনক ব্যবসা নিয়ে ইকুয়েডরের ভিতরেই ব্যাপক সমালোচনা রয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সাম্রাজ্যবাদীদের প্রকাশ্য ও গোপন শর্তগুলি মেনে নিয়ে তাদের চাপের কাছে মাথা নুইয়ে সরকার যে 'বড় সমস্যা' থেকে বেঁচেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অন্যদিকে এই ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রাফায়েল কোরেয়া নিজের স্বার্থে তা ব্যবহার করতে উঠেপড়ে লেগেছেন। তাঁর শাসনকালে কীভাবে ন্যায়নীতি ও অধিকার রক্ষা পেত তা নিয়ে বাগাড়ম্বর করেছেন, যা সর্বৈব মিথ্যা।

সবশেষে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'আমরা যারা ইকুয়েডরের শ্রমিক, যুবক, সাধারণ মানুষ, এই ঘটনার আলোয় তাদের বুঝে নিতে হবে সরকারের আসল চেহারা, যা স্পষ্টতই সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থবাহী। এই সরকারের জনবিরোধী, জাতীয়তাবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সংগ্রামের লক্ষ্যে আমাদের ঐক্য ও সংগঠন দৃঢ়তর করতে হবে।

মোদিজির ‘ভাইয়োঁ ঔর বহেনোঁ’ কারা

একের পাতার পর

বিভাজন, বিদ্বেষকেই হাতিয়ার করছেন বিজেপি নেতারা। ধর্মকে, জাতপাতকে কেন্দ্র করে এক দল শোষিত মানুষের বিরুদ্ধে আর এক দল শোষিত মানুষকে তারা খেপিয়ে তুলছে, দাঙ্গা বাধাচ্ছে।

বিজেপি শাসনে মানুষের দারিদ্র আরও বেড়েছে, বেকারি বেড়েছে, আরও মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে, আরও কলকারখানা বন্ধ হয়েছে। হ্যাঁ, অগ্রগতি কি হয়নি? অবশ্যই হয়েছে। তা দেশের নিরানব্বই ভাগ সাধারণ মানুষের নয়, এক ভাগ শিল্পপতি-পুঁজিপতির। সরকার না দিলেও তার স্পষ্ট হিসাব দেশের মানুষের হাতে রয়েছে— যাকে কোনও ভাবেই প্রধানমন্ত্রী কিংবা তাঁর দল আড়াল করতে পারছে না। পুঁজিপতিদেরই একটি সংস্থা ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম তাদের রিপোর্টে দেখিয়েছে, ভারতের মোট সম্পদের ৭৩ শতাংশই কুক্ষিগত করেছে মাত্র ১ শতাংশ পুঁজিপতি। বিজেপি নেতারা বলতে পারেন, এ তো স্বাধীনতার পর থেকে দেশ যে নিয়মে চলছে তার ফল। ঠিকই, পুঁজিপতি শ্রেণির এই অবাধ লুণ্ঠনকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে দেশের শাসন প্রক্রিয়ায়, দেশের আইনে, সংবিধানে। কিন্তু যে নরেন্দ্র মোদি সবার বিকাশের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ছাপান্ন ইঞ্চির ছাতি চাপড়ে সবার জন্য সুদিন আনার কথা বলেছিলেন তাঁর রাজত্বে সেই লুণ্ঠন প্রক্রিয়া কি বন্ধ হয়েছে? বন্ধ হওয়া দূরের কথা, এ যাবৎ কালের মধ্যে পুঁজিপতিদের লুঠতরাজ সবচেয়ে তীব্র আকার নিয়েছে গত পাঁচ বছরের বিজেপি শাসনে। কেমন তা? উপরোক্ত রিপোর্ট বলছে, ২০১৭ সালে যেখানে দেশের ধনকুবেরদের সম্পদের পরিমাণ ছিল ২৩ লক্ষ ১৮ হাজার কোটি টাকা, মাত্র এক বছরে, ২০১৮ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৩১ লক্ষ ৩৪ হাজার কোটি টাকা। প্রতিদিন তাঁদের সম্পদ বৃদ্ধির পরিমাণ ২২০০ কোটি টাকা। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ যখন মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, ছাঁটাইয়ের আক্রমণে জর্জরিত, দুবেলা দু’মুঠো খাবার জোগাড় করতে হিমসিম খাচ্ছে, তখন পুঁজিপতিদের এই অস্বাভাবিক সম্পদবৃদ্ধি ২০০৮ সালে বিশ্বজুড়ে মন্দার পর কোনও বছরে বিশ্বে সর্বাধিক।

দেশের সম্পদের এই নির্বিচার লুঠতরাজের সুযোগ পুঁজিপতিদের তো করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং তাঁর সরকারই। আর জনগণের জন্য কী করেছে তাঁর সরকার? দেশের সম্পদের মাত্র ৪.৮ শতাংশ রয়েছে ৬০ শতাংশ মানুষের হাতে। এই সীমাহীন বৈষম্য ঘোচানোর কোনও উদ্যোগই নেয়নি মোদি সরকার। আর্থিক বৈষম্য ঘোচানোর উদ্যোগের দিক থেকে মোদির ভারত বিশ্বে ১৫৭টি দেশের মধ্যে ১৪৭ নম্বরে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের খরচের দিক থেকে ভারত বিশ্বে ১৫১ নম্বরে। তা হলে প্রধানমন্ত্রী তাঁর নির্বাচনী বক্তৃতায় যে আত্মবিশ্বাস ও অগ্রগতির কথা বলছেন তা কাদের? অবশ্যই দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের। কারণ একমাত্র তাঁদেরই অগ্রগতি ঘটেছে। স্বাভাবিক ভাবেই নরেন্দ্র মোদির শাসনে তাঁদের আত্মবিশ্বাসও বেড়েছে। তিনি জনগণকে যতই ‘ভাইয়োঁ ঔর বহেনোঁ’ সম্বোধন করুন, তাঁর আসল ভাই তো আম্বানি টাটা আদানি নীরব মোদি মেহুল চোকসিরা। তাই তো গত লোকসভা নির্বাচনে এইসব শিল্পপতি-পুঁজিপতিরাই তাঁদের ‘বিকাশ পুরুষ’ নরেন্দ্র মোদি এবং তাঁর দলকে জেতাতে পুঁজি একেবারে ঢেলে দিয়েছিল এবং এবারও দিয়েছে। দেশের সমস্ত খবরের কাগজে প্রতিদিন পাতার পর পাতা, চ্যানেলগুলিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, মোবাইলে মুহুর্মুহু এস এম এসের প্রচারের জন্য হাজার হাজার কোটি খরচের টাকা তো তারাই জুগিয়েছিল, গত পাঁচ বছরে তার বহুগুণ তাদের উশুল করে নেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে বিজেপি সরকার। তাই তো দেশের মানুষ অর্ধাহারে অনাহারে থাকলেও, বিনা চিকিৎসায় ধুঁকলেও তাদের মুনাফা আকাশ ছুঁয়েছে। ফলে বিজেপি শাসনে কাদের অগ্রগতি ঘটেছে তা বুঝতে দেশের মানুষের বাকি নেই।

প্রধানমন্ত্রী জনগণকে যতই ‘ভাইয়োঁ ঔর বহেনোঁ’ সম্বোধন করুন, তাঁর আসল ভাই তো আম্বানি টাটা আদানি নীরব মোদি মেহুল চোকসিরা। তাই তো নির্বাচনে এইসব শিল্পপতি-পুঁজিপতিরাই তাঁদের ‘বিকাশ পুরুষ’ নরেন্দ্র মোদি এবং তাঁর দলকে জেতাতে পুঁজি একেবারে ঢেলে দিয়েছিল এবং এবারও দিয়েছে।

বিজেপি নেতারাও বুঝে গেছেন ওই আচ্ছে দিনের বুজরুকি এবার আর কাজ দেবে না। তাই মানুষের জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলিকে ঢাকতে তাঁরা এবার উগ্র জাতীয়তাবাদের জিগিরকে হাতিয়ার করেছেন। সাথে রয়েছে গোয়েবলসীয় কায়দায় মিথ্যাচার। অর্থাৎ মিথ্যা কথাকে জোরের সাথে বলতে থাকলে, বারে বারে বললে মানুষ প্রাথমিক ভাবে তা বিশ্বাস করে ফেলবে। সেই বিশ্বাসকে পুঁজি করে ভোটে জিততে পারলেই শাসন ক্ষমতা হাতের মুঠোয়। প্রধানমন্ত্রী এই সাক্ষাৎকারে নিজেই বলেছেন, “আমার যে কোনও বক্তৃতা খতিয়ে দেখুন, তার একটা বড় অংশ কিন্তু উন্নয়নের কথা বলে।” অর্থাৎ মানুষের বাস্তব জীবনে উন্নয়নের চিহ্নমাত্র না থাকলেও প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতায় উন্নয়নের ছড়াছড়ি। এমনি করেই মানুষের জীবনের এক মিথ্যা চিত্রকে তাঁরা জোরের সঙ্গে তুলে ধরছেন। আর তাকেই দেশময় ছড়িয়ে দিচ্ছে বিজেপির আসল পরিচালক যে পুঁজিপতি শ্রেণি, তাদের পরিচালিত সংবাদপত্র এবং টিভি চ্যানেলগুলি।

প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘যে সব অশুভ শক্তি ভারতকে দুর্বল করছে তাদের বিরুদ্ধেই আমার চ্যালেঞ্জ।’ কোন অশুভ শক্তি ভারতকে দুর্বল করছে? একশো তিরিশ কোটি ভারতবাসীর নিরানব্বই ভাগ সাধারণ মানুষ একবাক্যে বলবেন, দারিদ্র, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, দুর্নীতি, পুঁজিপতিদের বেপরোয়া লুঠপাটই ভারতকে তথা ভারতের মানুষকে দুর্বল করছে। প্রধানমন্ত্রী কি এই অশুভ শক্তিগুলির বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন? একেবারেই না। বরং অত্যন্ত সাবধানে, চালাকির মধ্য দিয়ে, কথার কারসাজিতে এই সব আসল অশুভ শক্তিগুলির বিরুদ্ধে লড়াইটাকে তাঁরা এড়িয়ে যাচ্ছেন। পরিবর্তে দেশের মানুষের সামনে কিছু কাল্পনিক অশুভ শক্তি খাড়া করছেন।

জওয়ানদের মৃত্যু নিয়ে যেভাবে প্রধানমন্ত্রী সহ বিজেপি নেতারা ভোটের রাজনীতি করছেন, এ দেশে তা নজিরবিহীন। দেশের মানুষ জওয়ানদের নিয়ে এই রাজনীতি একেবারেই পছন্দ করছে না। চাপে পড়ে ঢোঁক গিলে প্রধানমন্ত্রী বলছেন, “সন্ত্রাস এবং জওয়ানদের মৃত্যু কি মূল বিষয় নয়?” সন্ত্রাসকে সত্যিই প্রধানমন্ত্রী মূল বিষয় মনে করলে পাঁচ বছর পরে হঠাৎ ভোটের সময়ে এসে তাঁর সে কথা মনে পড়ল কেন? সন্ত্রাসরোধে যদি তিনি এতই আন্তরিক তো চল্লিশ জন জওয়ানের উপর হামলার গোয়েন্দা আশঙ্কা থাকলেও তাঁর সরকার তা আটকানোর ব্যবস্থা করেননি কেন? কারা এর জন্য দায়ী তাদের এখনও চিহ্নিত করা গেল না কেন। পুরো বিষয়টা নিয়ে দেশের মানুষকে ধোঁয়াশার মধ্যে রাখা হল কেন? এই সব কোনও প্রশ্নেরই উত্তর প্রধানমন্ত্রীর কাছে নেই। তাই এ নিয়ে যাঁরাই প্রশ্ন করছেন তাঁদেরই দেশদ্রোহী বলছেন তাঁরা। বালাকোটে জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংসের খবর গোটা বিশ্বের সংবাদ মাধ্যম অস্বীকার করলেও নির্বাচনী প্রচারে সেটাকে তাঁর সরকারের এক বিরাট সাফল্য হিসাবে তুলে ধরছেন প্রধানমন্ত্রী। এমনই হয়। জীবনের মূল সমস্যাগুলি সমাধানে যারা ব্যর্থ হয় তারাই এমন করে কাল্পনিক কোনও সমস্যাকে তুলে এনে তাকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে দেখিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। বিজেপি সেই কাজটাই করছে।

বাস্তবে বিজেপি, কংগ্রেস কিংবা আঞ্চলিক দলগুলি সবাই পুঁজিপতি শ্রেণির পলিটিক্যাল ম্যানেজার হিসাবে কাজ করে চলেছে। তাই এদের একজনকে সরিয়ে অন্য জনকে ক্ষমতায় বসানোর দ্বারা সাধারণ মানুষের, শোষিত মানুষের জীবনের সমস্যাগুলির কোনও সুরাহা হবে না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নির্বাচন হল, পুঁজিপতিদেরই পলিটিক্যাল ম্যানেজার এই দলগুলি কে ক্ষমতায় বসে পুঁজিপতিদের দেশের সম্পদ লুণ্ঠনের ব্যবস্থা করে দেবে, জনগণের উপর আরও মূল্যবৃদ্ধি, করের বোঝা চাপিয়ে তাদের শোষণ করবে এবং বিনিময়ে নিজেরা এমএলএ এমপি মন্ত্রী হবে, এই লুঠপাটে ভাগ বসাবে তারই প্রতিযোগিতা। এই নির্বাচনের সাথে সাধারণ মানুষের স্বার্থের কোনও সম্পর্ক নেই। শোষিত মানুষের মুক্তির একমাত্র পথ হল জনসাধারণের দাবিগুলি নিয়ে সঠিক নেতৃত্বে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলা, তার মধ্য দিয়ে জনগণের নিজস্ব সংঘশক্তি গড়ে তোলা এবং বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণির দলের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা।

কমরেড প্রশান্ত ঘটক চিকিৎসাধীন

এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর কন্ট্রোল কমিশন সদস্য কমরেড প্রশান্ত ঘটক দীর্ঘকাল ধরে হাইপারটেনশনে কষ্ট পাচ্ছেন। তাঁর বয়স ৭৬। কিডনির সমস্যার জন্য তাঁকে নিয়মিত ডায়ালিসিসও করা হচ্ছে অনেক দিন থেকে।

সম্প্রতি গুরুতর অসুস্থ হয়ে গত ১২ এপ্রিল ২০১৯ থেকে তিনি ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালের ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে ভর্তি রয়েছেন। এখন তিনি সেপটিক শকে আক্রান্ত। নেফ্রোলজিস্ট, নিউরোলজিস্ট, কার্ডিয়োলজিস্ট এবং ক্রিটিক্যাল কেয়ার-এর চিকিৎসক দল তাঁকে দেখাশোনা করছেন।

খরার কবলে কর্ণাটক

চারের পাতার পর

ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। রাজ্য মন্ত্রীসভার ৯ সদস্যের এক টিম ১৪টি জেলা পরিদর্শন করে ফসলের ক্ষয়ক্ষতি এবং অবিলম্বে কেন্দ্রের ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফান্ড (এনডিআরএফ) থেকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের বিষয় নিয়ে রিভিউ মিটিং করে। খরিফ ও রবি শস্য চাষের সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন— বন্যা, ভূমিধস, খরায় প্রায় ৩২ হাজার ৩৩৫ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত মাত্র ৯৪৯.৪৯ কোটি টাকা ধার্য হয়েছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই সামান্য। এমনকী এনডিআরএফের নিয়ম অনুযায়ীও ৪৪৬০ কোটি টাকা পাওয়ার কথা।

কেন্দ্রীয় সরকার নিজেদের দায়িত্ব অস্বীকার করতে নতুন ও সন্দেহজনক পন্থা খুঁজে বের করে এবং কৃষকদের প্রতারিত করে। তারা খরা কবলিত এলাকাগুলির শ্রেণিবিন্যাস করতে নতুন নিয়ম তৈরি করে। কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতা হয় ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে— যখন ইউনিয়ন মিনিস্ট্রি অফ এগ্রিকালচারাল এবং ফার্মারস ওয়েলফেয়ার নতুন মাপকাঠি ঠিক করে দেয়, যাতে অত্যন্ত খরাকবলিত এলাকাও কেন্দ্রীয় এই তালিকার অর্ন্তভুক্ত না হয়।

এতে স্বাভাবিকভাবেই অল্প খরাপ্রবণ এলাকা কেন্দ্রের রিলিফ ফান্ডের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে না। স্পষ্টত, একমাত্র মারাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগে রাজ্য সরকার ‘ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফান্ড’-এর কাছে আর্থিক ক্ষতিপূরণের দাবি জানালে কিছু পাওয়া যেতে পারে। এই ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ এক দশক বা দু’দশকে একবারই ঘটে। অল্প খরাপ্রবণ হলে রাজ্যকে নিজস্ব ফান্ড থেকে খরচ করতে হবে।

ভারতের ৬৮ শতাংশ এলাকা খরায় ক্ষতিগ্রস্ত। এর মধ্যে ৩৩ শতাংশে মোট বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৭৫০ মিলিমিটার কম হওয়ায় ‘দীর্ঘ খরা কবলিত’ বলে পরিচিত। এছাড়া ৩৫ শতাংশ এলাকায় গড় বৃষ্টিপাত ৭৫০-১,১২৫ মিলিমিটার হওয়ায় ‘খরা কবলিত’ হিসাবে চিহ্নিত হয়। উপদ্বীপ অঞ্চলের এবং পশ্চিম ভারতের শুষ্ক, আধা-শুষ্ক এবং আধা-স্যাঁতসেঁতে এলাকাই প্রাথমিকভাবে খরাপ্রবণ। এই রাজ্যগুলির খরার প্রকোপ এবং খরাপ্রবণ হিসাবে চিহ্নিতকরণের নিজস্ব পদ্ধতি রয়েছে। নতুন মাপকাঠি অনুযায়ী, রাজ্য সরকারের চারটির মধ্যে অন্তত তিনটি প্রমাণ নির্দয়ভাবে লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে তবেই ভয়ঙ্কর খরার জন্য কেন্দ্রীয় সাহায্য পাওয়ার যোগ্য হবে।

এটা কোনও গোপন বিষয় নয় যে, প্রকৃতি ও আবহাওয়ার পরিবর্তন অনেকাংশে খরার প্রকোপ বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। সরকারের থেকে কৃষক এবং কৃষি ক্ষেত্রে সহায়তার প্রয়োজন জরুরি। কেন্দ্র সরকার নির্লজ্জভাবে চালাকির সাথে নিজের দায়িত্ব রাজ্যগুলির ঘাড়ে চাপিয়ে কৃষকদের ভয়ঙ্কর দুর্দশার মুখে ঠেলে দিচ্ছে। রাজ্য সরকারের করুণার তোয়াক্কা না করে অবশেষে কৃষকরা বারেবারে ঘটে চলা খরার প্রতিকারে রাস্তায় নেমেছেন।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

প্রবীণ নেতা কমরেড রণজিৎ ধর চিকিৎসাধীন

এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর পলিটবুরো সদস্য কমরেড রণজিৎ ধরের বয়স এখন ৮৯ বছর। দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, কিডনি এবং হৃদরোগের চিকিৎসা চলছিল। আগে মূত্রনালীর ক্যান্সার ও অপারেশনেরও ইতিহাস রয়েছে তাঁর। এছাড়াও নানা শারীরিক অসুবিধার জন্য বহু বছর ধরে নানা ওষুধ নিয়ে থাকেন তিনি। সম্প্রতি মূত্রের সাথে রক্তক্ষরণ, হাঁটাচলায় ভারসাম্যহীনতা, মস্তিষ্কে স্ট্রোক এবং ইনফেকশনের কারণে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। ডাঃ অশোক সামন্তের নেতৃত্বে বিশেষজ্ঞরা তাঁর চিকিৎসা করেছেন। রক্তক্ষরণ, ভারসাম্যহীনতা এবং ইনফেকশন নিয়ন্ত্রণে আসার পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হলেও স্মৃতিক্ষয়, কথাবার্তায় সাযুজ্যহীনতা এবং হাঁটাচলায় ভারসাম্যের অভাব থেকে যায়। বয়সজনিত স্মৃতিদৌর্বল্য এবং আচার-আচরণের অস্বাভাবিকতার জন্য তাঁর চিকিৎসা চলতে থাকে।

ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালের চিকিৎসক দল ছাড়াও স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ গৌতম গুহ এবং মনোবিদ ডাঃ পৃথ্বীশ ভৌমিক তাঁর চিকিৎসা করছেন। এছাড়াও ডাঃ গৌতম সরকার ও ডাঃ অনুপ মাইতি যাঁরা দীর্ঘকাল কমরেড রণজিৎ ধরের চিকিৎসা করেছেন, তাঁদের পরামর্শও নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে বাড়িতেই প্রয়োজনীয় ওষুধ-পথ্য ও অন্যান্য সহায়তাগুলি দিয়ে তাঁর চিকিৎসা চলছে।

নিয়ম বহির্ভূত কাজের বিরুদ্ধে আশাকর্মীদের ডেপুটেশন

আশা কর্মীদের 'দিশা' ডিউটির সময় নিয়ম বহির্ভূত কাজ করানো এবং দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে ১৬ এপ্রিল উলুবেড়িয়া হাসপাতালে সুপারের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয় পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের হাওড়া জেলার পক্ষ থেকে। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদিকা ইসমৎ আরা খাতুন ও জেলা সংগঠক নিখিল বেরা।

বিমান বসু'র হুঁশিয়ারি প্রসঙ্গে কিছু কথা

বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান ও সিপিএমের বর্ষীয়ান নেতা বিমান বসু গত ১৬ এপ্রিল চাকদহে এক নির্বাচনী জনসভায় তাঁদের প্রার্থীর সমর্থনে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, "বিজেপি-কে দিয়ে তৃণমূলকে হারানোর কথা ভুলেও ভাববেন না।" ত্রিপুরায় বিজেপি'র লুঠ-সন্ত্রাস থেকে শিক্ষা নিতে বলেছেন তিনি।

চাকদহের সমাবেশটি ছিল সিপিএম প্রার্থীর সমর্থনে। বোঝাই যায় সেখানে জমায়েতের অধিকাংশই ছিল দলের সংগঠিত অংশ। সিপিএমের নেতা-কর্মী-সমর্থকরাই সেখানে প্রধানত ছিলেন। এই রকম একটি সভায় বিমানবাবুর এই উক্তি বুঝিয়ে দেয় যে, তিনি সিপিএমের কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশ্যেই কথাগুলি বলেছেন।

তাঁর এই আকস্মিক হুঁশিয়ারি প্রমাণ করল যে, সিপিএমের কর্মী-সমর্থকদের একটা বড় অংশের মধ্যে বাস্তবেই একথা ঘুরছে, 'এবার ভোটে বিজেপিকে ভোট দাও, না হলে তৃণমূলকে হঠানো যাবে না।' কোথাও গোপনে চাপা গলায়, কোথাও প্রকাশ্যেই সিপিএম কর্মীদের মুখে বিজেপির প্রতি সমর্থন শুনে বামমনস্ক বহু মানুষই হতবাক। তৃণমূলের দ্বারা সরকারি ক্ষমতা হারিয়ে সিপিএম কর্মীদের রাজনৈতিক আদর্শগত অবস্থানটা এই দাঁড়াল শেষমেশ! প্রকাশ্য সভায় হুঁশিয়ারি দিয়ে বিমান বসু বুঝিয়ে দিলেন, তাঁরা এ-খবর জানেন। জানারই কথা। একটি 'মার্কসবাদী' বলে দাবি করা ও শক্তিমান পার্টির কর্মীরা সরকারি ক্ষমতা হারিয়েই বিজেপির প্রতি সদয় হয়ে পড়ছেন। দলে দলে বিজেপিতে গিয়ে যোগ দিচ্ছেন। আর, এখন ভোটের মুহূর্তে নেতারা সাবধানবাণী দিচ্ছেন। কিছু দিন আগে এই প্রসঙ্গে দলের কর্মীদের উদ্দেশ্যে তাদের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র বলেছিলেন, 'বিষ চেখে দেখবেন না।' তারপরও কিন্তু বিজেপির দিকে সিপিএম কর্মী-সমর্থকদের একাংশের ঢল কমেনি।

তবে এতকাল ধরে 'বামপন্থা' ও 'মার্কসবাদ'-এর কী চর্চা হল তাঁদের? নেতারা কী শিক্ষা দিলেন কর্মীদের সঠিক রাজনৈতিক চেতনায় সঞ্জীবিত করতে? ভবিষ্যৎ কিন্তু জবাব চাইবেই।

আমরা মনে করি, বামপন্থার নামে সিপিএম নেতাদের ভোটসর্বস্ব সুবিধাবাদী রাজনীতির চর্চাই এই পরিণাম ডেকে এনেছে।

চিটফান্ড ঃ আন্দোলন ছাড়া সমস্যার সমাধান নেই ঃ মত বুদ্ধিজীবীদের

চিটফান্ড সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজতে সিঙ্গুরের রতনপুর কোলে পাড়ার মোড়ে ৭ এপ্রিল সারাদিন ধরে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিষয়—চিটফান্ড সমস্যা সমাধানের পথ। ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ও পথিকৃৎ সংগঠনের অন্যতম সদস্য সুদীপ্ত দাশগুপ্ত, চিটফান্ড ব্যবসার উৎপত্তি, বিস্তার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরে দেখান যে ক্ষতিগ্রস্ত আমানতকারী ও এজেন্টদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ছাড়া এই সমস্যা থেকে মুক্তির কোনও পথ নেই।

সঙ্গীত শিল্পী অসীম গিরি বলেন, সিঙ্গুরের জমি রক্ষার আন্দোলনে আমি ছিলাম, এই সরকার তখন ক্ষমতায় আসেনি। জিততে হলে আপানাদের একটা কাজ করতে হবে, আপনাদের ছেলে-মেয়ে-স্ত্রী সকলকে নিয়ে আন্দোলনে রাস্তায় নামতে হবে। আপনারা জিতবেন। শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী বুদ্ধিজীবী মঞ্চের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তীও আন্দোলনের পথেই এই সমস্যা সমাধানের দিশা দেখিয়েছেন। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন, অল বেঙ্গল চিটফান্ড সাফারারস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রূপম চৌধুরী, জেলা সভাপতি মহাদেব কোলে, সম্পাদিকা অমিতা বাগ, প্রফুল্ল মান্না প্রমুখ।

ধর্ষণকারীর শাস্তির দাবিতে বাঙ্গালোরে বিক্ষোভ

কর্ণাটকের এক রায়চুরে ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রীর ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে এ আই ডি এস ও, এ আই ডি ওয়াই ও এবং এ আই এম এস এস-এর পক্ষ থেকে ২০ এপ্রিল ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।

নির্বাচনী প্রচারের মধ্যেই ওই দিন বাঙ্গালোর শহরে এই সংগঠনগুলি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। বক্তব্য রাখেন এ আই এম এস এস-এর রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড শোভা। তিনি অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন।

রায়চুরে বিক্ষোভ

বাঙ্গালোরের সভায় বক্তব্য রাখছেন কমরেড শোভা

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com